ARYAN BIOGRAPHY

OR

THE LIVES OF A FEW ANCIENT

ARYAN HEROES

PART I.

BY

RAMÁNÁTH SARASWATÍ M. A.

PROFESSOR, SANSKRIT, DACCA COLLEGE.

আর্য্য-জীবনী

অর্থাৎ

কতিপয় আর্য্য মহাপুরুষের জীবন চরিত।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরমানাথ সরস্বতী প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE GIRISA-VIDYÁRATNA PRESS

24, GIRISA-VIDYÁRATNA'S LANE

1881.

সূচনা।

আর্য্যজীবনীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে কতিপয় আর্য্য-মহাপুরুষের জীবনী বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত পাঠ করিবার অপেক্ষা দেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে পাঠকগণ যে অধিকতর উপকার লাভ করিতে পারিবেন. তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবনচরিত চরিত্র সংশোধন এবং চরিত্রসংগঠনের একটী প্রধান সাধক। অনেক ব্যক্তি জীবনচরিত পাঠ দ্বারা প্রভূত উপকার পাইয়াছেন।

এই ভাগে যে জীবনীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। অবশিষ্টগুলি সমস্তই তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাতে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশকালে এই প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের দ্বারা প্রশংসিত হয়। তদনন্তর আমার কতিপয় বিদ্বৎ-সমাজ-পরিচিত বন্ধু এই প্রস্তাব সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আর্য্য-জীবনীর প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ ইহার অপরাপর ভাগ প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

এক্ষণে ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সকাশে সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যালয়ে এই আর্য্য-জীবনী পাঠ্যরূপে গ্রহণপূর্ব্বক আমার এতাদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করুন। অলমধিকেন ইতি।

ঢাকা কালেজ,
২৫ জুলাই, ১৮৮১।

গ্রন্থকারস্য।

নির্ঘণ্ট।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২১	দশার্ণরাজ, সুধর্ম্মা	দশার্ণরাজ সুধর্ম্মা,
৪২	৩।৪।৫	১৬৯০ প্রভৃতি	১৫৯০, ১৬৯০, ১৬১২
৪৩	১৬	পণ্যবহুল	পণ্যবাজিত
৬৯	২১	সন্নিহিত	সন্নিহিত।
৬৮	১৩	পৃথিবীর	পৃথিবীর ও পৃথিবী
১২৪	৮	উপাদন	উৎপাদন

আর্য্য-জীবনী।

ধর্ম্মবীর।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হস্তিনাপুরস্থ (১) পৌরববংশে কুরু নামে একজন ধর্ম্মজ্ঞ সুবিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নামে তৎপ্রদেশস্থিত কুরুজাঙ্গল এবং কুরুক্ষেত্র (২) এই স্থানদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যাবধি পৌরববংশ কুরুবংশ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই কুরুবংশে বিচিত্রবীর্য্যনামধারী একজন প্রথিতনামা নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র

---

(১) হস্তিনাপুর কৌরবদিগের রাজধানী, বর্ত্তমান বিজনোর নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মিরট নগরের উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণ তটে স্থিত ছিল। সুহোত্রতনয় হস্তী নামে নৃপতি ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) বর্ত্তমান স্থানেশ্বরের সন্নিহিত। কুরুক্ষেত্র বর্ত্তমান দিল্লীর প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। মহারাজ কুরু এই স্থানে তপস্যা করিতেন। ইহার আর এক নাম ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানে সমন্তপঞ্চক নামে একটী সরোবর আছে, তাহার অন্যান্য নাম ব্রহ্মসর, বায়ুসর, পবনসর ও রামহ্রদ। নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত।

জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠতা-সত্ত্বেও রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেবপিতা শূর-দেবের কুন্তী নামে এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। পাণ্ডু নৃপতি এই শূরকন্যা কুন্তীর পাণিগ্রহণ করেন। যদুকুল-শিরোমণি বাসুদেব কৃষ্ণ কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বলিলে কুন্তীর পরিচয় অনেকের সুবোধ হইবে। কুন্তীর প্রকৃত নাম পৃথা; কিন্তু তাঁহার পিতা শূরদেব তাঁহাকে অনপত্য নিজ সখা কুন্তীভোজ মহীপতিকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুন্তী হইয়াছিল। কুন্তীকে বিবাহ করিবার কিছু দিন পরে পাণ্ডু রাজা মদ্ররাজভগিনী মাদ্রী নামে একটী কন্যার পাণিপীড়ন করেন। পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বহুদিন সুখোপভোগ করিয়া স্বীয় জিগীষা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র (৩) প্রভৃতি বহুবিধ জনপদ জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিলেন। তদনন্তর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে তিনি হস্তিনাপুরস্থিত প্রাসাদনিলয় পরি-ত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে বাসস্থান নিবেশিত করিয়া

---

(৩) মগধ, মিথিলা ও কাশী রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীর টিপ্পনীতে উক্ত। সুহ্ম বর্ত্তমান ত্রিপুরা ও আরাকান। পুণ্ড্র দেশ বর্ত্তমান পাবনা। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে মহা- নদী এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইহার নামান্তর।

মৃগয়াচরণে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র-মুখ-নিরীক্ষণে সুখী হইতে পারিলেন না। অনন্তর পাণ্ডুদেব নিজপত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে পুত্রার্থে দেবগণের আরাধনা করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কুন্তী ধর্ম্মদেবের অনুগ্রহে যুধিষ্ঠির, বায়ুদেবের অনুগ্রহে ভীমসেন, এবং ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহে অর্জ্জুন নামে ক্রমশঃ তিন পুত্র প্রসব করিলেন এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেব নামে দুই যমক পুত্র প্রসব করিলেন। কুন্তীর দ্বিতীয় সুত ভীমসেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর প্রথম পুত্র দুর্য্যোধন এক দিনে জন্মগ্রহণ করেন। কলিযুগের ৬৫৩ অব্দ অতীত হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন শুক্লপঞ্চমী তিথির অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দুই প্রহরের সময় যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হন। এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮৩ অব্দ চলিতেছে। (যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় এই জীবনীর শেষভাগে বিবৃত করিব।) যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল যে "এই নরশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, বিক্রমশালী এবং সত্যবাদী নৃপতি হইয়া যুধিষ্ঠির নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন। ইহাঁর যশঃ এবং তেজঃ সর্ব্বত্র প্রথিত হইবে।" তদনন্তর ক্রমশঃ আর চারি পুত্রের জন্ম হইল। পাণ্ডু নৃপতি পঞ্চ পুত্র লাভে অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া দৈববাণী অনুসারে পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। হিমালয়-স্থিত ঋষিগণ পাণ্ডু নৃপতির দেবদত্ত, মহাবল, শুভলক্ষণসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন, কুরুবংশবিবর্দ্ধন পঞ্চ পুত্র দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

পুত্রগণের শৈশবাবস্থাতেই পাণ্ডুর স্বর্গলাভ হইল। মাদ্রী

তাঁহার সহগমন করিলেন। কুন্তী পুত্রগণের প্রতি-পালনে যত্নবতী হইলেন। তদনন্তর হিমালয়স্থিত তাপসগণ পাণ্ডুপুত্র এবং কুন্তীকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন, এবং রাজবাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক ধৃত-রাষ্ট্রের সমীপে সকল বৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র বহুমানপুরঃসর তাপসগণকে বিদায় দিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে স্বপুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বেদোক্ত সংস্কার সকল প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সুখভোগপূর্ব্বক অনুদিন দুর্য্যোধনাদির সহিত বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনেরা শত ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরেরা পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া দ্বারা আমোদ করিতেন। দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ কৌরব নামে এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ পাণ্ডব নামে আখ্যাত হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিতেন বলিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারিতেন না। পাণ্ডুপুত্রদিগের এক পিতৃব্য বিদুর অনুক্ষণ তাহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরাদিও সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেন। অনন্তর ধৃত-রাষ্ট্র তাঁহাদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গৌতমগোত্রোৎপন্ন শারদ্বত কৃপাচার্য্যের অধীনে রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দ্রোণা-চার্য্যের নিকটে অশেষবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন।

তদনন্তর সংবৎসরাবসানে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ ধৃতি, সহিষ্ণুতা, স্থিরতা, ঋজুতা এবং অনুকম্পার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল। অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই যুধিষ্ঠির স্বকীয় বিনয়, সদাচার, শৌর্য্য বীর্য্যাদি প্রকাশ এবং প্রজাদিগের অনুরঞ্জন দ্বারা স্বপিতা পাণ্ডুরাজার কীর্ত্তি অন্তর্হিত করিলেন। প্রকৃতিরঞ্জন দ্বারা তাঁহার যুবরাজ নাম সার্থক হইল। তিনি প্রজাদিগের অভাবমোচন, অত্যাচারনিবারণ, শিক্ষাদান এবং সংরক্ষণ দ্বারা কিরূপে প্রজারঞ্জন করিতে হয় তাহার জলন্ত উদাহরণ সকলকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনে সন্তুষ্ট পুরবাসিগণ এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল যে "বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতা হেতু রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, অতএব তিনি এক্ষণে নৃপতি হইতে পারেন না। শান্তনুতনয় ভীষ্মদেব পূর্ব্বে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনি কখন অধুনা রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। অতএব আমরা তরুণবয়স্ক সমরকুশল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং অনুকম্পাশীল পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিব। যুধিষ্ঠিরই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত বিবিধভোগবিশিষ্ট করিবেন।" পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্বানুরাগ এইরূপে প্রকটন করিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণের এইরূপ কল্পনা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং পিতৃসমীপে গমন-

পূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "হে পিতঃ, পৌরগণ আপনাকে এবং ভীষ্মকে অনাদর করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যদি পাণ্ডুর রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কখনই রাজ্য ভোগ করিতে পাইব না। অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "বৎস, পাণ্ডু ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাদিগের অনুরাগ-ভাজন ছিলেন। পাণ্ডু আমাকে ও অন্যান্য জ্ঞাতিদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও গুণবান্, ধার্ম্মিক এবং প্রজানুরঞ্জক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পাণ্ডু অমাত্য, সৈন্য, ও ভৃত্যগণকে সতত ভরণ পোষণ করিতেন। ইহারা পাণ্ডুকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছে, এক্ষণে অবশ্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত এবং পক্ষপাতী হইবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আর যুধিষ্ঠিরের কোন দোষের লেশমাত্র নাই; অতএব কিপ্রকারে আমরা যুধিষ্ঠিরকে তাহার পিতৃপৈতামহ রাজ্য হইতে চ্যুত করিব? যুধিষ্ঠিরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই পৌরগণ আমা-দিগকে বধ করিতে উদ্যত হইবে।" তখন দুর্য্যোধন কহিল, "আমি প্রজাদিগকে অস্মৎপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব। আপনি পাণ্ডবদিগকে শীঘ্র হস্তিনাপুর হইতে বারণাবত নগরে (৪) প্রেরণ করিবার উপায় চিন্তা করুন।"

---

(৪) বর্ত্তমান এলাহাবাদ।

তদনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সাহায্যে প্রজাবৃন্দকে অর্থ ও মান প্রদান দ্বারা বশীভূত করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রও এক দিন সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন; এবং তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে রমণীয় বারণাবত নগর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে বলিলেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বারণাবতে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মাতার সহিত গুরুজনদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারণাবতে এক বৎসর বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এ দিকে নৃশংস দুর্য্যোধন পুরোচন নামক একজন যবনকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবদিগের তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বাসার্থে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদুরের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও সমীপে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিদুরের উপদেশানুসারে জতুগৃহমধ্যে এক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বথা সতর্ক হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে ভীমসেন জতুগৃহে অগ্নিদানপূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সুরঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সুরঙ্গ-পথে আসিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে বিদুর তাঁহাদিগের জন্য একখানি নৌকা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই নৌকাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা গঙ্গা পার হইলেন এবং পরপার-

স্থিত মহাবনে কিয়দ্দিন বাস করিয়া একচক্রা(৫) নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদিগের দাহ-বৃত্তান্ত প্রচার হইল; এবং ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলে বহু বিলাপ করিয়া তাহাদিগের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ও দিকে পাণ্ডবেরা একচক্রানগরে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থলে ভীমকর্ত্তৃক বকাসুর-বধ সাধিত হয়। এই নগরে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতেন তথায় এক দিন কতকগুলি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ইহারা পাঞ্চালদেশে(৬) দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা বলিতেছিল। পাণ্ডবগণ উহা শুনিয়া সাতিশয় চঞ্চলচিত্ত হইলেন; এবং মাতার অনুমতি লইয়া পাঞ্চালদেশে প্রয়াণ করিলেন। পাণ্ডবেরা পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুসারে এক কুলালের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে যথাসময়ে স্বয়ংবর সভাতে গমনপূর্ব্বক সমস্ত দর্শন করিলেন। অর্জ্জুন মীননেত্র ভেদ করিয়া জয় লাভ করিলেন এবং দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভ্রমবশতঃ প্রদত্ত মাতার আজ্ঞানুসারে পঞ্চ ভ্রাতা মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এতৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠির-

(৫) একচক্রা বর্ত্তমান আরা।

(৬) পাঞ্চালদেশ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদিতে স্থিত কান্যকুব্জ প্রদেশ। কনোজ, কাম্পিল্য, এটোয়া প্রভৃতি নগর ইহার অন্তর্গত।

জীবনীর বিষয় নহে বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ক্রমে দ্রৌপদী বিবাহ-বৃত্তান্ত হস্তিনাপুরে সকলে জানিতে পারিলেন। এত দিন পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে ছিলেন, বিবাহকালেও কেহ তাঁহাদিগকে পাণ্ডুপুত্র বলিয়া জানিতে পারে নাই। তখন ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে আনয়নার্থ পাঞ্চালরাজ্যে বিদুরকে পাঠাইলেন, এবং যথাকালে পাণ্ডবেরা কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পৌরগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "যিনি আমাদিগকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতেন, যিনি আমাদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিতেন, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির অদ্য পুনর্ব্বার আসিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন প্রজাবৎসল পাণ্ডুদেবই আমাদিগের প্রিয় সাধন করিতে বন হইতে আগমন করিতেছেন। যদি আমাদিগের দানজন্য, হোমজন্য এবং তপস্যাজন্য কিছু পুণ্য থাকে, তবে পাণ্ডবগণ শত বৎসর এই নগরে বাস করুন।" পুরবাসীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বগুরুজনের পাদবন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর। কেন মিছামিছি বিবাদ করিবে, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে (৭) গমন কর এবং সেই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর। সে

(৭) বর্ত্তমান দিল্লী যে স্থানে স্থিত।

স্থানে কেহ তোমাদিগকে বাধা দিবে না। আর রাজ্যের অৰ্দ্ধাংশ গ্রহণ কর।" যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানুসারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন এবং তথায় স্বর্গসংকাশ এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণ ও বিদুরের পরামর্শানুসারেই করিয়াছিলেন। তিনি তথায় শান্তি স্থাপন করিয়া নগরের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন এবং প্রাকার দ্বারা নগর বেষ্টন করিতে আদেশ দিলেন। গগনস্পর্শী সৌধমালা, মন্দরোপম দৃঢ় পুরদ্বার, অভেদ্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রক্ষিত দুর্গ প্রভৃতি পরিপাটীরূপে রচিত হইল। দুর্গোপরি হস্তক্ষেপ্য লৌহনির্ম্মিত শক্তিযন্ত্র সকল এবং শতঘ্নী সকল স্থাপিত হইল। শস্ত্রাদিকুশল যোধগণ দুর্গরক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। নগরমধ্যে সুবিভক্ত রাজপথ সকল প্রস্তুত হইল। সেই ধনধান্যসম্পূর্ণ নগরী কুবেরপুরী এবং ভোগবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যমুনাতীরে এই পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম দিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-নিপুণ দ্বিজগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে ধনার্থী বণিকগণ তথায় আগমন করিতে লাগিল। সংস্কৃত প্রাকৃতাদি সৰ্ব্বভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ ইন্দ্র-প্রস্থ অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশিল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ তথায় নিবাসার্থ উপস্থিত হইল। আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, জম্বু, পারিজাত, করবীর প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষের উদ্যানে ইন্দ্রপ্রস্থ চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত হইল।

বিবিধ লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, কৃত্রিম লীলাপর্ব্বত, জলপূর্ণ বাপী, পুষ্করিণী ও তড়াগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের রমণীয়তা শত-গুণ বর্দ্ধিত হইল। এবম্ভূত পুরী-মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও বলদেব দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া যুধিষ্ঠির প্রজা-শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকৃতিসমূহ ত্রিবর্গসাধক ধর্ম্মরাজকে প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। তিনি নীতিমার্গানুসারে সমভাবে সকল প্রজাকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ কাহার উপর অত্যাচার করিতে চাহিত না, সর্ব্বত্র নির্ম্মল পবিত্র শান্তি বিরাজমান ছিল। যুধিষ্ঠির ব্রহ্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, এবং নীতিনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি ভ্রাতৃ-গণের সহিত নানাবিধ সৎকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। ধৌম্যাদি পুরোহিতগণ সর্ব্বদা তাঁহার সভাতে বিরাজ করি-তেন। তাঁহার প্রজাগণের নেত্র এবং হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হই-য়াছিল। প্রজাগণ যে কেবল তৎকৃত শাসন ও পালন হেতু সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তিনি তাহাদিগের মনোরম কার্য্য করিতেন বলিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি অচল-ভক্তিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল। কোন প্রজা কখন তাঁহার কোন অযুক্ত, অসত্য, দুঃখদ বা অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে নাই। তিনি সকলের প্রিয়চিকীর্ষা ও হিতেচ্ছা দ্বারা সর্ব্ব-কার্য্যে প্রণোদিত হইতেন। এইরূপে প্রজানুরঞ্জন এবং অধীন নৃপতিগণের সুশাসন হেতু যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি দিগ্দিগন্তরে ঘোষিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে এক দিন মহর্ষি নারদ পাণ্ডবদিগের সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে "তোমরা কদাপি দ্রৌপদীকে লইয়া সুন্দোপসুন্দের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিও না। তোমাদের পরস্পর ভেদ হইলে সর্ব্বনাশ। অতএব সময় নির্দ্ধারণ করিয়া তোমরা দ্রৌপদীকে উপভোগ করিবে।" নারদের এই সদুপদেশ পাণ্ডুপুত্রেরা শিরোধার্য্য করিলেন। পরে পাঞ্চালীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন এই পঞ্চভ্রাতার পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইল। ইহাদিগের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার-কার্য্য মহর্ষি ধৌম্য যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর ইহারা বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সকাশে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিল। এই সকল সুচরিতব্রত পুত্রগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রেরা সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

যৎকালে খাণ্ডব-বন দাহ করা হইয়াছিল, তৎকালে অর্জ্জুন ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ময়দানব এই উপকারের নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়া বলিল "আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" অর্জ্জুন বলিলেন আমি তোমাকে প্রাণনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া, তোমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে ইচ্ছা করি না। তথাপি তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে চাহি না; তুমি কৃষ্ণের কোন কার্য্য সাধন কর। বাসুদেব ময়দানব-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত তাহাকে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটী উৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ

করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া ময়দানব তাঁহার নিমিত্ত সর্ব্বরত্নবিভূষিত দশসহস্রকিষ্কুপরিমিত এক মণিময় সভা নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্দ্দশ মাসে সভানির্ম্মাণ সমাপন করিয়া ময়দানব যুধিষ্ঠিরকে গিয়া নিবেদন করিল। তদনন্তর অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান এবং নানাদেশীয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যুধিষ্ঠির মণিময় সভাতে প্রবেশ করিলেন।

কিছু দিন পরে একদা যুধিষ্ঠিরের সভাতে দেবর্ষি নারদ আগমন করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিলেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচার করিলে অনুরক্ত প্রজাগণ সকলেই ইহার অনুমোদন করিল। যে রাজা স্বাধীন ও ক্ষাত্র-শ্রী যুক্ত, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন। রাজসূয় যজ্ঞে সামবেদ-বিহিত মন্ত্রের দ্বারা ষট্প্রদেশে অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। রাজসূয় অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ সম্পন্ন করিয়া অবশেষে অভিষিক্ত হইতে হয়। রাজসূয়ে অভিষেক দ্বারা সর্ব্বজিত্ব লাভ হয়। সুতরাং যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতাকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মগধপতি জরাসন্ধ, কলিন্দাদিভূপালগণ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত, শাকলদ্বীপাধীশ্বর প্রতিবিন্ধ্য, পার্ব্বতীয় রাজগণ, বাহ্লীকরাজ, কাম্বোজরাজ, পাঞ্চালাধিপতি, বিদেহনৃপতি, দশার্ণরাজ, সুধর্ম্মা, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, শূরসেনরাজ, মাহিষ্মতীপতি নীলরাজ, মৎস্যরাজ (৮)

(৮) কলিন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে, চন্দ্রভাগা ও শতদ্রু নদীর মধ্যস্থিত মদ্রদেশের পূর্ব্বে স্থিত। প্রাগ্জ্যোতিষপুর বর্ত্তমান

পঞ্চনদাধিপতি প্রভৃতি ভূপালবৃন্দকে পরাজিত করিয়া তাঁহা-দিগের নিকট হইতে করগ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার সঞ্চয়ার্থ ভৃত্যগণকে নিয়োগ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও রাজগণের নিমন্ত্রণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মাদি সকলকে আনয়ন করিতে নকুল হস্তিনা-পুরে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বিপ্রগণ ও রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই সমুচিত সপর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রাথমিক অর্ঘ দানার্থ নানা বাদানুবাদ হইল; কিন্তু পরিশেষে ভীষ্মের অনুজ্ঞাতে কৃষ্ণকেই প্রথম অর্ঘ প্রদান করা হইল। এতদ্দর্শনে চেদীশ্বর শিশুপাল ক্রোধপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে ভর্ৎসনা করিয়া সভামণ্ডপ হইতে নির্গমন করিলেন। তদনন্তর

আসাম, রামায়ণে ধর্ম্মারণ্য নামে উল্লিখিত। শাকলদ্বীপ পঞ্চ-নদপ্রদেশের অন্তর্গত স্থান বিশেষ। বাহ্লীক বর্ত্তমান বাল্খ (Balkh) ও তৎসন্নিহিত দেশ, বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যে স্থিত। কেকয় রাজ্যের উত্তরে আর একটি বাহ্লীক বা বাহিক দেশ ছিল। কাম্বোজ আধুনিক তাতারান্তর্গত ক্যাসগর (Kashgar)। পাঞ্চাল কান্যকুব্জ। বিদেহ মিথিলা। দশার্ণ মালব দেশের অন্তর্গত, বিদিশা ইহার রাজধানী। শূরসেন মথুরাপ্রদেশ। মাহিষ্মতী হৈহয়রাজ্য বা উত্তর নর্ম্মদাপ্রদেশের রাজধানী, নর্ম্মদা-নদীতটস্থ, মহেশমণ্ডল এবং মহেশ্বরপুর ইহার নামান্তর। মৎস্যদেশ মথুরা ও ব্রজের ঠিক পশ্চিমে, ইহার রাজধানী বিরাট নগর ইন্দ্রপ্রস্থের ৪২ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে এবং জয়পুরের ২০ ক্রোশ উত্তরে স্থিত। বর্ত্তমান জয়পুরকে অনেকে মৎস্য-দেশ বলেন। দিনাজপুর যে মৎস্যদেশ সেটী ভ্রম।

কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। রাজগণ ও বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরের সকাশ হইতে সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির রাজগণের নিকট হইতে বহুমূল্য হীরক ও মণিমুক্তাদি, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, মহার্ঘ কৌষেয় প্রভৃতি বস্ত্র, অদ্ভুত লৌহ ও গজদন্তবিনির্ম্মিত দ্রব্যসামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য পশুলোম ও পক্ষীর পক্ষপত্রে রচিত দ্রব্য সকল এবং নানাবিধ সুজাত অশ্ব ও হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৯)

---

(৯) রাজসূয় যজ্ঞ কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে, আধুনিক দরবার এবং লেভির উল্লেখ করিলে পাঠক একপ্রকার ভাবগ্রহ করিতে পারেন। এই ইন্দ্রপ্রস্থে লর্ড লরেন্স এবং লর্ড লিটন বাহাদুরেরা দুইবার যে দরবার করিয়াছেন তাহাই অধুনাতন কালের রাজসূয় যজ্ঞ। পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞ একটী বৃহৎ ব্যাপার ছিল। রাজা সর্ব্বগুণে গুণবান্ এবং সর্ব্বপ্রধান না হইলে এই যজ্ঞে তাঁহার অধিকার থাকিত না। এবং সর্ব্বাংশে প্রভুত্ব লাভই ইহার উদ্দেশ্য। এ স্থলে একটী যজ্ঞীয় বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিলে ইহা বুঝা যাইতে পারে। পুরোহিত যজমানকে সকল প্রজার মধ্যস্থলে আনিয়া কৃষ্ণ যজুর্বেদের এই মন্ত্রটী পাঠ করেন। মাতৃত মাস্বস্ত ক্ষত্রস্যোম্বমসি ক্ষত্রস্য যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতি রাবিন্ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূবা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে। এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে এই বলা হইল যে এই রাজা (যজমান) এই যজ্ঞদ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাকুলত্ব লাভ করিলেন। এই মন্ত্র পাঠ হইলে যজমান বলিলেন "যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবন্ত্যঃ সূচরামি নত্বহং গর্ব্বোক্তিং ভনামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ" অর্থাৎ আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না। যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বর-প্রসাদেই আমার এই যজ্ঞফল মহাপদ লাভ হইল আপনাদিগকে ইহাই

এস্থলে ইন্দ্রপ্রস্থের ভূগোল-বিষয়ে দুই একটী কথা অসঙ্গত হইবে না। ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান দিল্লী সহর পূর্ব্বতন ইন্দ্রপ্রস্থের প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে স্থিত। যমুনা নদীর তৎকালীন স্রোতঃ ইদানীন্তন কালীন স্রোতের প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ পশ্চিম প্রবাহিত হইত। পাণিপ্রস্থ, শোণপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও ব্যাঘ্রপ্রস্থ নামে পঞ্চপ্রস্থ ছিল। ব্যাঘ্রপ্রস্থ ব্যতীত আর চারিটীই যমুনার পশ্চিম-তীরস্থিত। ইহাদিগকে এক্ষণে পাণিপত, শোণপত, ইন্দ্রাপত, তিলপত ও বাঘপত কহে। ইন্দ্রাপতের আর এক নাম পুরাণকিল্লা। ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক বাহিরে নিগমবোধ ঘাট বলিয়া যমুনার একটী ঘাট আছে। প্রবাদানুসারে এই ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ সমাপ্তির পরে হোম করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর এই স্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। যে দিন সোমবারে অমাবস্যা হয় সেই দিন মেলা আরম্ভ হয়। তৎপ্রাদেশিক প্রবাদ এই

জ্ঞাত করিতেছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই সর্ব্বাধিপত্য ব্রাহ্মণের সহ্য হইবে কেন। যজমান এই কথা বলিবামাত্র পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বলিতেন "ভোঃ ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা; সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" ভারতবাসিগণ! এই যজমান তোমাদের সকলেরই রাজা, সোমদেব আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের রাজা। এই বলিয়া ক্ষত্রিয়ের অধীনত্ব স্পষ্ট অস্বীকার করিতেন। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, যেখানে বল সেইখানেই প্রভুত্ব, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে প্রয়াসী হন। ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রভুত্বে ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং সম্ভবতঃ সেই বিরক্তি হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া একটা ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব সাধিত হয়।

যে, অশ্বমেধ হস্তিনাপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হস্তিনাপুর গঙ্গার উপকূলে স্থিত। এই দেশীয় প্রবাদ মহাভারত বিরুদ্ধ।

দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিতে গমন করিয়া নানা-প্রকারে বিপ্রলব্ধ ও উপহসিত হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পাণ্ডবদিগের সমৃদ্ধি চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিলেন। দ্যূতক্রীড়াদ্বারা পাণ্ডব-দিগের ঐশ্বর্য্যহরণই দুর্য্যোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানাইলে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া স্বীকার করিয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি শকুনি এবং যুধিষ্ঠির খেলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব হারিলেন এবং অবশেষে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে পণ করিয়া পরাজিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে অবমাননা করিতে উদ্যত হইলেন। ভীম কুরুকুল বিনাশ করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা-বাক্যে ক্ষান্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক বলি-লেন "রাজন্, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ, আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন।" তখন ধৃতরাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসা পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন এবং বিবিধ যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা ভ্রাতৃসদ্ভাব রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরাদিও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল না দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থ অনুমতি যাচ্ঞা করিল। ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাদির নিষেধ অতিক্রম করিয়া স্বপুত্রের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে আবার হস্তিনাপুরে আনয়ন করা হইল। আবার শকুনির সহিত দ্যূতারম্ভ এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়। বনগমনার্থ প্রস্তুত হইয়া যুধিষ্ঠির সভ্যগণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ স্বজননী কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রাখিয়া বনে প্রয়াণ করিলেন। সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিতে লাগিল। পৌরগণ বিলাপ ও ধৃতরাষ্ট্রের যথোচিত নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। হস্তিনাপুরে নানারূপ মহোৎপাত উপস্থিত হইল। বিনামেঘে বজ্রপাত ও ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। অসময়ে রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। সর্ব্বদা উল্কাপাত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহর্ষি নারদ কৌরব-সভাতে আগমন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে এক্ষণ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে। নারদ এই সংবাদ দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই অবসরে কৌরবেরা দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত বিদুরকে আদেশ করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাবেশ ও পরিতাপ দূর হইল না।

পাণ্ডবগণ বনগমনে বহির্গত হইয়া রথারোহণে জাহ্নবী-

জীবন্ত প্রমাণবটের (১০) সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় কিয়দ্দিন বাস করিয়া কাম্যক বনে প্রবেশ করিলেন। কাম্যক বনে বিদুর যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নানা সদুপদেশ দান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসকাশে একাকী প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা কাম্যকবন হইতে দ্বৈতবনে, দ্বৈতবন হইতে পুনর্ব্বার কাম্যকবনে গমন করিয়া তথায় পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিলেন। ইত্যবসরে যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব রাজের নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া নৈমিষারণ্য (১১), অগস্ত্যাশ্রম, কলিঙ্গাদি দেশ, প্রভাসতীর্থ, মন্দর ও গন্ধমাদন পর্ব্বত, নারায়ণাশ্রম, আর্ষ্টিষেণাশ্রম প্রভৃতি নানাবিধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলেন। দ্বৈতবনে বাসকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ বিহারার্থে এবং স্বসমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগকে পরিতাপিত করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিল। দ্বৈতবনে পর্য্যটন কালে উহারা গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বিবাদ করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ ও হৃত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমাদি বীরগণ গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া কৌরবদিগকে মোচন করেন।

---

(১০) রামায়ণের শ্যামবট। ইহার অপর নাম অক্ষয়বট।

(১১) কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত প্রভাসতীর্থ গুর্জ্জর প্রদেশের সোমতীর্থ। মন্দর পর্ব্বত ভাগলপুরের নিকটে স্থিত। গন্ধমাদন পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। নারায়ণাশ্রম প্রভৃতি হিমালয়ের উপরিস্থ।

পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার দ্বৈতবন হইতে কাম্যক বনে গমন করিলেন। কাম্যকে তাঁহারা মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলে সিন্ধুপতি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যান; কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করেন। কাম্যকে কিছু দিন বাস করিয়া পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার দ্বৈতবনে প্রস্থান করেন। দ্বৈতবনে মৃগয়া করিয়া পাণ্ডবেরা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন কোন ব্রাহ্মণের অরণী-সহিত মন্থনদণ্ড হরণ করিয়া একটী মৃগ পলায়ন করে। পঞ্চভ্রাতা এই মৃগের অন্বেষণে গমন করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নকুলকে জল আনয়ন করিতে বলিলেন। নকুল একটী সরোবর দেখিয়া তাহার জল পান করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল "হে তাত! আমার নিয়ম আছে যে, যে ব্যক্তি আমার প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবে, সেই ব্যক্তিই এই সরোবরের জল পান করিবে। অতএব তুমি সাহসিক কার্য্য করিও না। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দান কর, পরে জল পান করিও।" নকুল শূন্যস্থিত বকের এই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যেমন জলপান করিতে উদ্যত হইলেন অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন, কিন্তু সহদেবেরও পূর্ব্বোক্ত দশা ঘটিল। তৎপরে অর্জ্জুন ও তৎপশ্চাৎ ভীমসেনও উক্ত সরোবরে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গতাসু

হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অনাগমনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বয়ং সেই সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন।

তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় যুগান্তে লোকপালচতুষ্টয়ের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দর্শনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তৎপরে নানাপ্রকার আশঙ্কা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। অবশেষে ভাবিলেন, বোধ হয় দুর্য্যোধন আমাদিগের উপাংশু-বধ-সাধনার্থ এই সরোবরের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। পরে তিনি তৎপরীক্ষার নিমিত্ত ঐ জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। অন্তরীক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বাক্য উচ্চরিত হইল। তখন যুধিষ্ঠির উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন যে একটী বক বলিতেছে, "আমি তোমার ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি পঞ্চম ব্যক্তি, অতএব আমার প্রশ্নসমূহের উত্তর দান করিয়া জল পান কর।" অনন্তর যুধিষ্ঠির সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই বককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। বক ক্রমান্বয়ে পঞ্চত্রিংশৎটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং যুধিষ্ঠিরও তৎসমস্তের যথার্থ উত্তর প্রদান করিলেন।

তন্মধ্যে কয়েকটী প্রশ্ন বিশেষ উপযোগী বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। ভূমির অপেক্ষা গুরুতর কি? গগন অপেক্ষা উচ্চতর কি? বায়ুর অপেক্ষা শীঘ্রতর কি? তৃণ অপেক্ষা বহুতর কি? এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর;—মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা গগনাপেক্ষা উচ্চতর; মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর; এবং চিন্তা তৃণাপেক্ষা বহুতর।

এই লোকে পরম ধর্ম্ম কি? জ্ঞান কাহাকে বলে? দয়ার লক্ষণ কি? মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু কি? মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি কি? সাধু ব্যক্তির লক্ষণ কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর,—ইহ লোকে আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধের নাম জ্ঞান; সর্ব্বভূতের সুখৈষিতাকে দয়া বলে; ক্রোধ মনুষ্যের দুর্জ্জয় রিপু; লোভ মনুষ্যের অনন্ত ব্যাধি; ক্রোধ, লোভ, নির্দয়তা প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সর্ব্বপ্রাণির হিতকর কার্য্যে রত হন, তিনিই সাধু।

এই জগতে কে সুখী? এই জগতে কোন্ পথে চলা উচিত? এই সংসারের বার্ত্তা কি? এই পৃথিবীতে আশ্চর্য্যই বা কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর;—যে ব্যক্তি কাহারও নিকট ঋণী নহে, যে প্রবাসে থাকে না এবং যে নিজগৃহে পাঁচ ছয় দিবস অন্তরও স্বাধীন ভাবে শাকান্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। তর্কদ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না, শ্রুতি সকল পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী, ব্যাখ্যাতা ঋষিগণের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞান গুহাভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, অতএব বহুজনসম্মত পথই অবলম্বন করা উচিত। মহাকাল, সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং রাত্রি দিবা রূপ কাষ্ঠের দ্বারা এই মহামোহময় সংসার-কটাহে ভূতগণকে, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টনপূর্ব্বক পাক করিতেছেন, ইহাই সংসারের সমাচার। প্রতিদিনই সহস্র সহস্র জীবগণ শমন-সদনে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহারা আপনাদিগকে চিরস্থায়ী ও অনশ্বর মনে করিতেছে, ইহাই মহৎ আশ্চর্য্য।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া বকরূপী ধর্ম্মদেব পাণ্ডবদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নানাবিষয়ক সদুপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ত্রয়োদশ বর্ষ যাপন করিবার মানসে বিরাটরাজ্য মৎস্য দেশে গমন করিলেন এবং ছদ্মবেশে বিরাটের অধিকারে নিযুক্ত হইয়া একবর্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন। এ দিকে দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইলেন, কিন্তু উহারা পাণ্ডবদিগের কোনও সন্ধান পাইল না। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম ধারণপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়া এক বৎসর অতীত করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়া মৎস্যরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির উহার নিকট রাজ্যের অর্দ্ধভাগ চাহিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহা দিতে স্বীকার করিল না। তখন যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্য্যে যাইতে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার ভার গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রয়াণ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনকে সন্ধি-প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিলেও, দুর্য্যোধন তাঁহাদের কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে কৃষ্ণ বলিলেন যে, তুমি সমস্ত রাজ্য ভোগ কর, কিন্তু পাণ্ডবদিগকে পাঁচ খানি গ্রাম(১২) প্রদান কর। প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন বলিল "আমি

---

(১২) কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অবসান এই পঞ্চ গ্রাম।

বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও উহাদিগকে দিব না।" তখন কৃষ্ণ নিরাশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং পাণ্ডবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণী (১৩) সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করিলেন। এই যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে এক বৎসর গত হইল। পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ অষ্টাদশ দিন ক্রমাগত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ ও অপরদেশীয় রাজগণ স্ব স্ব মিত্রপক্ষের সহায়তা করিতে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত এবং মদ্ররাজ শল্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। শল্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে যুদ্ধে নিহত হন। এই ভীষণ মহা সমরে দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা নিহত হন। উভয় পক্ষের প্রায় সমুদয় সৈন্য নিহত হইয়া, পাণ্ডব পক্ষের সাত জন এবং কৌরবপক্ষে তিন জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। পাণ্ডবগণ পঞ্চভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন, এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই তিন জন মাত্র। সুতরাং পাণ্ডবেরাই জয়লাভ করিলেন। এই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট নৃপতিগণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে শোণিতনদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। ভীষ্মপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে,

---

(১৩) ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক এই সৈন্যসমষ্টি এক অক্ষৌহিণী।

এই কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ মার্গশীর্ষ মাসের প্রথম দিনাবধি অষ্টাদশ দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর দিনে ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর জন্য বহু বিলাপ করিয়া যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের সকাশ হইতে নানাবিধ সদুপদেশ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ ভারতীয় বহুসংখ্যক রাজাকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। উত্তরে ত্রিগর্ত্ত (১৪) প্রভৃতি, পূর্ব্বে মণিপুর প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ পাণ্ডবদিগের আধিপত্য স্বীকার করিল। ব্যাসের উপদেশানুসারে যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইলেন। এবং যথাসময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

এইরূপে অনেক কাল যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত একত্র বাস করিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত গঙ্গাতীরস্থ গঙ্গাদ্বারের নিকটে এক অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুন্তী এবং বিদুরও সেই আশ্রমে বাসার্থ প্রস্থান করিলেন। বিদুর তপশ্চর্য্যা দ্বারা শরীর

---

(১৪) ত্রিগর্ত্ত বর্ত্তমান তিব্বত দেশ।

শীর্ণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা নারদঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দাবাগ্নি দ্বারা বনমধ্যে দগ্ধ হইবার সংবাদ দিলেন। পাণ্ডবেরা ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেন।

তৎপরে দ্বারকানগরীতে কৃষ্ণ ও বলদেব ভবলীলা সমাপ্ত করিলেন। এই সমাচার শ্রবণে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক উহাঁদিগের সৎকার এবং ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণবংশীয় বৃদ্ধ পুরুষ স্ত্রী এবং বালকগণকে দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিলেন। ইহাঁরা দ্বারকা পরিত্যাগ করিবামাত্র ঐ নগর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। উহাঁদিগকে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানে বাস করাইলেন। এই সমস্ত ঘটনা দর্শনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়া অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিলেন এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে মহাপ্রস্থান আরম্ভ করিলেন। বহু দিন পদব্রজে ভ্রমণানন্তর তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, এবং ইহার শৃঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রতাবলম্বন করিলেন। এই স্থানেই তাঁহারা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এতক্ষণে শেষ হইল। ইহা সংকলন করিতে আমরা মহাভারত হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল দেখিতে হইবে। জীবনীর মধ্যেই চরিত্রের কথা অনেক বলা গিয়াছে, তথাপি এ স্থলে কিছু বলা যাইতেছে। মহাভারতে

বর্ণিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের গতি সিংহের ন্যায় মহত্বগুণবিশিষ্ট; নাসিকা দীর্ঘ, লম্বমান, সুন্দর ও উজ্জ্বল, এবং নেত্রযুগল ইন্দীবর-সদৃশ ছিল। যুধিষ্ঠির হিন্দু চরিত্রের যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা, সাধুতা, বিবেকপরায়ণতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মভীরুতা, ধীরতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বলোকের অনুকরণীয়। তাঁহার অমানুষিক এবং অলৌকিক সাধু চরিত্র ইদানীন্তন কালে একান্ত দুর্লভ। তাঁহার গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস, পত্নীর প্রতি অনুরাগ ও সদ্ব্যবহার এবং অমিত্রগণের প্রতি সাধুতা প্রদর্শন ও বৈরাভাব কাহার না আন্তরিক প্রশংসা আকর্ষণ করে। সত্যবাদিতা, দয়াশীলতা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা এবং নির্ম্মৎ-সরতা তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল গুণ। তিনি কখন কোন কারণে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে নিরস্ত বা ধর্ম্মপথ হইতে বি-চলিত হইতেন না। "ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করে," এবং "যেখানেই ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়" এই দুই মহাবাক্য তাঁহার হৃদয়দর্পণে সর্ব্বদা প্রতিভাত থাকিত। কৌরবগণ কতবার তাঁহার কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, কিন্তু কখন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত ক্রোধ-পরবশ বা প্রতিহিংসা-প্রবণ হয় নাই। কৃষ্ণের নীতিকৌশলে তিনি একবার কিয়ৎপরিমাণে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য তাঁহার সত্যবাদিতাতে একান্ত বিশ্বাস হেতু পুত্রশোকে প্রাণ-ত্যাগ করেন। তজ্জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এক সময়ে বলিয়াছিলেন "তুমি কখন ধর্ম্মাধর্ম্ম

মিথ্যা কথা বল নাই, তুমি কখন কোন ব্যক্তির শত্রুতাচরণ কর নাই, তবে যে আমার পিতার সমীপে তোমার সেই স্বাভাবিক সত্যশীলতা ও বিদ্বেষাভাব ত্যাগ করিয়াছিলে তাহা কেবল আমার ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছিল।" যুধিষ্ঠির যখন কাহার হিংসা বা দ্বেষ বা কাহার প্রতি শত্রুতা ব্যবহার করিতেন না বলিয়া তাঁহাকে সকলে অজাতশত্রু (১৫), অজাতারি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিত। তাঁহার অনেক শত্রু ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও শত্রু ছিলেন না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের উন্নতির পরা কাষ্ঠা। তিনি জীবমাত্রেরই প্রতি মিত্রতাচরণ করিতেন। ধন্য তাঁহার পবিত্র চরিত্র! এই জন্যই অদ্যাপি তাঁহার নাম "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় সকলের আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া রহিয়াছে। যতকাল হিন্দুগণ জগতে স্থিতি করিবেন, ততকাল যুধিষ্ঠিরের

---

(১৫) অনেকে বলেন, যুধিষ্ঠিরের কেহ শত্রু ছিল না বলিয়া তাঁহার নাম অজাতশত্রু হইয়াছিল। এ অর্থ আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না, যেহেতু কৌরবেরা তাঁহার ঘোর শত্রু ছিল। আমরা অজাতশত্রু প্রভৃতি শব্দের অন্যবিধ অর্থ করিতে চাহি। জাত শব্দের অর্থ—যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ জীবগণ, জীবমাত্র। জাতদিগের অর্থাৎ জীবমাত্রের শত্রু জাতশত্রু, যিনি জাতশত্রু নহেন তিনি অজাতশত্রু। অজাতারি শব্দও এইরূপ। বেণীসংহার নাটকের তৃতীয়াঙ্কে অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "ন দ্বেক্ষি যজ্জনমতস্ত্বমজাতশত্রুঃ" যে হেতু তুমি কোন লোককে দ্বেষ কর না, অতএব তুমি অজাতশত্রু বলিয়া পরিচিত। এই বচন আমাদের প্রমাণ। আমরা অন্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

সাম তাঁহাদিগের মানসে ভক্তিরসের উদ্রেক করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না।

অবশেষে যুধিষ্ঠির কত দিন জীবিত ছিলেন এবং কোন্ সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এই দুটী বিষয় নিরূপণ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি। যুধিষ্ঠির অতি অল্প বয়স হইতে রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং বহুদিন পরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজাবলী গ্রন্থের অনুসারে যুধিষ্ঠির ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎপরে রাজ্যভোগ, বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হয়। পরে সন্ধির চেষ্টা এবং যুদ্ধোদ্যোগে এবং যুদ্ধাবসানে রাজ্যের শান্তি-বিধানে এক বৎসর গত হয়। অতঃপর যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে পুনঃ-রারোহণানন্তর ৩৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ বৎসর যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। ১২৬ বৎসর বয়ঃক্রম অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নহে। (১৬)

---

(১৬) শ্রুতি আছে "শত যুর্ব্বৈ পুরুষঃ" অর্থাৎ মনুষ্য সাধারণতঃ একশত বৎসর বাঁচে। কিন্তু ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনেক ব্যক্তি একশত বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক কাল জীবিত ছিলেন। পিটার্ক জারতেন নামক হঙ্গেরী-দেশীয় একজন কৃষক ১৮৫ বৎসর জীবিত ছিল (১৫৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৮২ খৃঃ অঃ)। লুইজা ফ্রাঙ্কো নাম্নী দক্ষিণ-আমেরিকা-নিবাসিনী এক কাফ্রী স্ত্রী ১৭৫ বৎসর জীবিত ছিল। হেনরি জেন্‌কিন্‌স নামক একজন দরিদ্র ব্যবসায়ী ইংরাজ ১৭৯ বৎসর এবং টমাস পার নামক একজন ভদ্র ইংরাজ ১৫২ বৎসর জীবিত ছিলেন। কাউণ্টেস ডেসমণ্ড নাম্নী ইংলণ্ডীয় একজন সম্রান্তবংশীয়া স্ত্রী ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। গ্রীস-

মনুষ্যের পরমায়ুর পূর্ব্বকাল অপেক্ষা অধুনা অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা এখনকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন।

এক্ষণে ইতিহাস যুধিষ্ঠিরের সময়সম্বন্ধে কি বলে দেখা যাউক। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ রাজ্যবিপ্লব প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং সামাজিক রীতি নীতির ও আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন অবলম্বন করিয়া যুগ-বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কলিযুগ এইরূপ কোন ঘটনা বা পরিবর্ত্তন অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিযুগের এক্ষণে ৪৯৮৩ অব্দ চলিতেছে। কাশ্মীর দেশের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে "কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির নৃপতির শাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়। এক্ষণে ১৮০৩ শকাব্দাঃ। অতএব ৬৫৪+২৫২৬+১৮০৩= ৪৯৮৩ কলিযুগাব্দ। আবার রাজাবলী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কলিযুগের ৩০৮৬ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠিরের প্রচলিত অব্দ বিলুপ্ত হয় এবং বিক্রমাদিত্যের

দেশীয় সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গেলেন ১৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন, আরব দেশে দুইশতবর্ষবয়স্ক মনুষ্য পর্য্যটকদিগের নেত্রপথে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালের ত কথাই নাই, অধুনাও অনেক২ লোককে একশত বৎসরের অধিক জীবিত থাকিতে দেখা যায়। (তত্ত্ববোধিনী নবম কল্প তৃতীয় ভাগ ৪০৭ সংখ্যা ৫০ পৃষ্ঠে "মনুষ্যের পরমায়ু" শীর্ষক প্রস্তাব দেখ)।

সংবৎ আরম্ভ হয়। সংবৎ ১৯৩৭। সুতরাং ৩০৪৬+১৯৩৭= ৪৯৮৩ কল্যব্দ। বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল-এবং এই স্থিতি শক-কালের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অতএব এক্ষণকার ১৮০৩ শকের সহিত ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে ৪৩২৯ বৎসর হয়। কলির ৪৯৮২ অব্দ গত হইয়াছে। ৪৯৮২ বৎসর হইতে ৪৩২৯ বৎসর বিয়োগ করিলে ৬৫৩ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। রাজতরঙ্গিণীতেও ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। কলির অব্দ যখন অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তখন ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। প্রচলনই ইহার সত্যতার পরিচায়ক লক্ষণ। অতএব যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথম কালের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই মহাভারতের কালনির্ণয় করিতে গিয়া ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা যে কত কাণ্ডই করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কেহ কেহ গণনা দ্বারা বলেন যে মহাভারতে উল্লিখিত গ্রহ-স্থিতি খৃষ্টের পূর্ব্বে ১৪২৪ অব্দে ঘটিয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গ্রহগণের উক্ত স্থিতি ঘটিতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির ১৮৮১+১৪২৪=৩৩০৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদিগের মতে ৪৩২৯ বৎসর পূর্ব্বে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে কোথা হইতে এই সমস্ত জানিতে পারেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে দিন অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্স এথিনিয়ম সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত ও ইংরাজী

সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয় সুনীকনামক তাঁহার দুরাত্মা সচিবের হস্তে নিহত হন। রাজ্যলুব্ধ সুনীক তাঁহার পুত্র প্রদ্যোতকে মগধসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পরে পঞ্চদশ জন মহীপতি মগধ-রাজ্যে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরাণের মতে চারিশত নবতি বৎসর। মহারাজ মহানন্দ ইঁহাদিগের পঞ্চদশতম। ইঁহার মহাপদ্ম নামে এক তনয় জন্মে। এই মহাপদ্মই ইতিহাসে নন্দনামে প্রথিত হইয়াছেন। মহা-পদ্মানন্দ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভূত ছিলেন। ইঁহার প্রতাপ এবং বীরত্ব বহুদূর বিদিত হইয়াছিল। কেহই তাঁহার শাসন উল্ল-ঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। যদ্যপি ইনি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সামাজিক প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। মহাপদ্মানন্দের নব পুত্র জন্মিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঔরসে মুরানাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত নামে আর এক পুত্র হইয়াছিল। এই চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এ প্রস্তাবে সঙ্কলিত করিব।

নন্দের পরলোকগমনানন্তর তাঁহার নয়জন পুত্র রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজ্যের অংশ দিতে অসম্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বধ করিবার উপক্রম করেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদপ্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় তক্ষশিলানিবাসী চাণক্যপণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাণক্যের সহিত তাঁহার যে দিন প্রথম আলাপ হয়, সে দিন তিনি

দেখিলেন যে, চাণক্য তক্রসেচনপূর্ব্বক কতকগুলি কুশাংকুরের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন; ইহাতে তাঁহাকে আপনার কার্য্যোপযোগী ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতাদৃশ সহায় প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন।

গ্রীসদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদপ্রদেশে ছিলেন, তখন মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং বিপাশানদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সেনানিবেশ প্রবেশ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বাচালতা ও স্বাধীনভাবে বাক্যপ্রয়োগ হেতু সেকন্দর তাঁহার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন না করিলে, নিশ্চয় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতেন। পরে তিনি কুসুমপুরে পলায়ন করেন; তথায় নব নন্দ-নরপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব-সময়ে রাজগৃহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে সংস্থাপিত হয়। কখন্ যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। নন্দ-নরপতিগণ প্রজারঞ্জনদ্বারা প্রজাবর্গের পরম অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষস নামে জনৈক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের অতিপ্রাচীন সচিব ছিলেন। রাক্ষসের অকৃত্রিম স্বামিভক্তি এবং রাজ্যের হিতচিন্তনহেতু সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত।

একদা চাণক্য রাজবাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন কারণবশতঃ তিনি নন্দ-নৃপতি-গণকর্ত্তৃক অপমানিত এবং সভা হইতে বহিষ্কৃত হন। এই নিষ্কারণ অবমাননা জন্য তিনি নন্দ-নৃপতিদিগের ধ্বংস সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল। চাণক্যের মন্ত্রণা ও বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নিজ ভ্রাতৃগণকে উপাংশুনিহত করেন এবং সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া চাণক্যকে নিজের মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে উগ্রধন্বা-নামক একজন নন্দপুত্রদিগের পক্ষীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের উপায় কল্পনা করিলে, তিনি নেপালরাজ্য হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং উগ্রধন্বাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনে দৃঢ়তররূপে সমাসীন হন। (১)

এ দিকে অমাত্য রাক্ষস স্বচক্ষে চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দ-নৃপতি-গণের সমুচ্ছেদ সন্দর্শনানন্তর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মলয়কেতুনামক জনৈক পার্ব্বতীয় রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ইহার সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মলয়কেতুকে কুসুমপুর আক্রমণ করিতে বলিলেন। মলয়কেতু সমুদয় নন্দরাজ্য পাইবেন বলিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসের মন্ত্রণাকৌশলে কুলূতদেশের অধিপতি চিত্রবর্ম্মা, মলয়দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীরাধিপ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুদেশভূপাল সিন্ধুষেন এবং বহুতুরঙ্গ-সৈন্যশালী পারসীকপতি মেঘাক্ষ প্রভৃতি

(১) Asiatic Researches, vol. v.

ম্লেচ্ছরাজগণ মলয়কেতুর সহায় হইল। অন্যান্য পার্থিবগণও মলয়কেতুর পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকার করিল। ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রধানপুরুষগণ মলয়কেতুর সহিত যোগ দিল। কুসুমপুরে জৈত্রযাত্রার জন্য খশ, মগধ, চেদি ও হূন সৈন্যগণ সমাগত হইতে লাগিল। গান্ধার ও যবনভূপালগণ এবং শকভূপতিগণ সজ্জিত হইতে লাগিল। সত্বরেই কুসুমপুর অবরোধ করিতে মলয়কেতু সসৈন্যে গমন করিলেন এবং দিন দিন নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই উৎসাহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল চন্দ্রগুপ্তের আর রক্ষা নাই। অমাত্য রাক্ষস কেবল এই যুদ্ধবিগ্রহের ভরসায় না থাকিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের নিমিত্ত এক বিষময়ী কন্যা গোপনে নিয়োজিত করিলেন, এবং যন্ত্রনির্ম্মাণ, বিষপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কয়েকজন প্রণিধি প্রেরণ করিলেন এবং অন্যান্য অনেক নীতিকৌশল প্রয়োগ করিলেন।

অমাত্য রাক্ষসের এই সকল কৌশল দেখিয়া নীতিজ্ঞ চাণক্য ভীত হইলেন না, ক্রমে ক্রমে সেগুলি ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। চাণক্য প্রথমতঃ নিজ আজ্ঞাবহ অনুচরগণকে এবং কার্য্যনিপুণ চরদিগকে মলয়কেতু এবং রাক্ষসের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বরেই উভয়েরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া উঠিল। অমাত্য রাক্ষস তাহাদিগের দ্বারা যে যে কার্য্য করিতেন, চাণক্য তৎসমস্ত জানিতে পারিতেন। অমাত্য রাক্ষস কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন

নাই, যে তাঁহার সেবকবর্গ চাণক্যের লোক এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যুক্ত। কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ এবং কোন্ ব্যক্তি বিপক্ষ, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত চাণক্য নানাভাষাকুশল চর সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণপূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করত তত্রত্য লোকদিগের আচার ব্যবহার অবগত হইতেছিল এবং কুসুমপুরবাসী নন্দনরপতির অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবদিগের গূঢ় ব্যাপার ও উপায় নিপুণরূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে তিনি রাক্ষসের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে পর্য্যন্ত স্ববশে আনিলেন।

চাণক্য জানিতেন যে, অমাত্য রাক্ষস স্বার্থশূন্য ভক্তিসহকারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন এবং কি প্রকারে প্রভুর শ্রেয়ঃ হইবে তাহাই অনন্যচিত্তে চিন্তা করিতেন। অনেক লোকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্পৎশালী প্রভুকে সেবা করে; কিন্তু রাক্ষস সেরূপ ছিলেন না। চাণক্য বিবেচনা করিলেন যে, রাক্ষসকে হস্তগত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করাইবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রাক্ষসের বুদ্ধি, বিক্রম, এবং ভক্তি, এই ত্রিবিধ গুণ ছিল বলিয়াই চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের বুদ্ধি, বিক্রম ও ভক্তি এই তিন গুণ থাকে, তাহারাই প্রকৃত ভৃত্য, এবং তাহাদের হইতেই স্বামীর সর্ব্বকালেই যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং চাণক্য রাক্ষসকে হস্তগত করিতে যতদূর সাধ্য যত্ন করেন। প্রথমতঃ রাক্ষস ও মলয়কেতুর বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার

নিমিত্ত চাণক্য এক কৌশল করিলেন। রাক্ষসের নামমুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত একখানি পত্র চন্দ্রগুপ্তের নিকটে প্রেরণ করাইলেন; সেই পত্র পথিমধ্যে চাণক্যের প্রেরিত মলয়-কেতুর বিশ্বস্ত সেবকদিগের দ্বারা ধৃত এবং মলয়কেতুর সমীপে আনীত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসের প্রতি মলয়-কেতুর সন্দেহ বদ্ধমূল হইলে, তিনি অমাত্য রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন, এবং তদ্বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষস পত্রের মর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন; সুতরাং তিনি সদুত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইলেন। ইহাতে মুগ্ধবুদ্ধি মলয়কেতু রাক্ষসকে অপমানিত এবং স্বসকাশ হইতে দূরীকৃত করিলেন। এবং চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি পাঁচজন মিত্ররাজকে মারিয়া ফেলিলেন। এই জন্য অপরাপর রাজারা "মলযকেতু অতি অবিবেচক ও দুর্বৃত্ত" ইহা বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ ভয়বিহ্বল সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মলয়কেতুর সেনানিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ভদ্রভট, পুরুষদত্ত প্রভৃতি চাণক্যপ্রেরিত প্রধানপুরুষগণ মলয়কেতুকে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎপরে রাক্ষস দুঃখিতান্তঃকরণে কুসুমপুরে আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চাণক্য তাহা জানিতে পারিয়া আর একটী কৌশলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। এক দিন চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং আপনি

অমাত্য রাক্ষসকে অভিবাদন করিয়া, যথাবিহিত বহুমানপুরঃসর চন্দ্রগুপ্তকেও তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে "বিজয়ী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে রাক্ষস হস্তগত হইলে চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমাত্য রাক্ষস অগত্যা তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপশ্চাৎ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমীপে রাক্ষসের নানাবিধ সদ্‌গুণ বর্ণন করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বের চিহ্নস্বরূপ শস্ত্র প্রদান করিলেন। অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে রাজপুরুষেরা মলয়কেতুকে হস্তপদে বদ্ধ করিয়া দ্বারদেশে স্থাপিত করিল। রাজপুরুষেরা কি করিতে হইবে এই বিষয় চাণক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, চাণক্য বলিলেন, এক্ষণে অমাত্য রাক্ষস রাজকার্য্য করিবেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন কর। রাক্ষস তখন চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, "রাজন্, তুমি ত জানই যে, আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম, অতএব ইহার প্রাণরক্ষা কর।" চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তিনি বলিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা রক্ষা করা উচিত।" তদনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

চন্দ্রগুপ্তরাজের জীবনীর এই স্থানে মুদ্রারাক্ষস-নামক নাটক শেষ হইয়াছে। এই নাটকে চাণক্যের বুদ্ধিচাতুরী এবং রাক্ষসের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি অতিস্পষ্টরূপে বর্ণিত

হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর শেষভাগ পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বায়ুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল আটাইশ বৎসর নিরূপিত আছে। কুমারিকাখণ্ডে এবং অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত কলিযুগের ২৭৯০ বৎসরে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদাতীরস্থিত শুক্লতীর্থে গমন করেন। এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮৩ অব্দ চলিতেছে। সুতরাং শুক্লতীর্থে গমন ৩১২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগের ২৬৯০ গত হইলে নন্দরাজ্য এবং তাহার একশত বৎসর পরে অর্থাৎ ২৭৯০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আরম্ভ হইবে। উপরিউক্ত কুমারিকাখণ্ডের সময়নিরূপণের সহিত ইহার মিল হয়। স্কন্দপুরাণের বচন—

"ততোঽপি ত্রিসহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যন্নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥"

অর্থাৎ তিন সহস্র বৎসরের তিন শত দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে নন্দরাজ্যের আরম্ভ। অনেকে "ত্রিসহস্রেষু" স্থানে "দ্বিসহস্রেষু" পাঠ করিয়া একসহস্র বৎসর পশ্চাতে ফেলেন।

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র ছিলেন। এই মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। ভাগবতের মতে ইহাঁরা পরীক্ষিৎ নৃপতির জন্মের ১৫১০ বৎসর (এতদ্বর্ষসহস্রঞ্চ (২) শতং পঞ্চ

(২) 'এতদ্বর্ষসহস্রে চ শতং পঞ্চদশোত্তরম্' পাঠ ধরিলে স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির সহিত ইহার ঐক্য হয়।

সংশোত্তরং) পরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং একশত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার মতে পরীক্ষিৎ কলিযুগের অশীতি অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কলিযুগের ১৬৯০ অব্দে নন্দরাজ্য-কাল। অতএব ১৭৯০ কলির অব্দে বা ১৩১২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সময়ের ঐক্য হয় না। প্রাচীন ভারতের কোন রাজার সময়নিরূপণ প্রায় অসম্ভব' তবে চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ে যাহা কিছু পুরাণাদিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠকমহাশয়কে উপহার দেওয়া গেল, তিনি ইহার ভিতর হইতে সারগ্রহণ করিবেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল চৌত্রিশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৌদ্ধমতে চন্দ্রগুপ্ত ৩২৬ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরাণমতে তিনি ২৫ বৎসর নিরুপদ্রবে মগধরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। কোন কোন মতে ২৯২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত নিজপ্রতাপ ভারতবর্ষের অনেকত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গ্রীক্ বা যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি দাক্ষিণাবর্ত্তে কৃষ্ণানদীর তটে চন্দ্রগুপ্তনগরী নামে এক নগরী সংস্থাপিত করেন। তত্রত্য লোকেরা চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস বিশেষরূপে অবগত আছে। মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতা এবং টীকাকার উভয়েই তদ্দেশীয় লোক। যবনসেনানী সেলিউকস্ ভারতবর্ষে নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আর এক বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বসৈন্যসামন্ত সমভি-

ম্যাহারে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবনদিগের আক্রমণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় এই আক্রমণ। মগধরাজ্য পরাক্রান্ত না থাকিলে যবনহস্ত হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা ভার হইত। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবনসেনাপতির সন্ধি ৩০২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল। প্রকৃতিবর্গ মগধরাজ্যের শান্তিচ্ছায়াতে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কালহরণ করিত, কোন উপদ্রব বা অত্যাচারের শঙ্কা ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর গঙ্গার উপকূলে স্থিত এবং পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ ও একক্রোশ বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ইহা বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল। নদীর বক্ষে শত শত বণিক্‌পোত ভাসিতে দেখা যাইত। নগরের মধ্যে নানাশ্রেণীর কারুশিল্পকর বাস করিত এবং অগণ্য-পণ্যবহুল বিপণি ও আপণমালা রাজপথের শোভা সম্পাদন করিত। হস্তিগণ অলঙ্কৃত সুচারু হাওদা পৃষ্ঠে করিয়া গম্ভীরপদবিক্ষেপপূর্ব্বক রাজপথে ইতস্ততঃ বিচরণ ও যাতা-য়াত করিত। অশ্বারোহিগণ তুরঙ্গমপৃষ্ঠে বিচিত্রগতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য এবং ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির কার্য্য করিতেন। চন্দ্র-গুপ্ত অতিশয় রণকুশল সেনাপতি এবং অতি সুবিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। তাঁহার চারি লক্ষ বেতনভোগী স্থির সৈন্য (standing army) ছিল। তিনি মৃগয়াশীল ছিলেন এবং শরাসন-

ধারিণী যবনীগণপরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে সভ্যতার আলোক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। জাতিভেদ এবং পৈতৃকব্যবসায়ানুসরণপ্রথা সম্যক্ প্রচলিত ছিল। রাজ্যের নানাবিভাগে সুযোগ্য রাজপুরুষদিগেরদ্বারা সুচারুভাবে রাজ্যশাসনকার্য্য ও শান্তিবিধান সম্পাদিত হইত। প্রজাদিগের গৃহে সুখ শান্তি বিরাজমান ছিল। প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত। বণিক্ ও শিল্পীরা রাজ্যের বিবিধপ্রকারে উন্নতিসাধন করিত। তাহারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে স্বস্বকার্য্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজাকে কর দিত। অধুনাতন ইংরেজরাজ্যে ব্যবসায়ীরা এবং শিল্পীরা আইনদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে স্বস্বকার্য্য করে বলিয়া রাজাকে কর দিয়া থাকে। অস্ত্রনির্ম্মাণ এবং পোতনির্ম্মাণের স্বতন্ত্র কার্য্যালয় ছিল এবং সেই সেই স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও পোত সকল নির্ম্মিত হইত। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় সম্মান-প্রদর্শন করিতেন। প্রতিবৎসর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া এক মহাসভা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রাজ্যের ও প্রজাদিগের উন্নতির উপায়চিন্তা করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্ব্বিধ রাজবৃত্ত সম্যক্ সাধন করিতেন। ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন, সেই অর্থের বর্দ্ধন, তাহার রক্ষণ এবং সৎপ্রকারে তাহার ব্যয় এই চারিটী কার্য্যই তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসময়ে সমাজে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মত প্রচলিত হইয়া সমাজকে অল্পকাল পরে

বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার উপযোগী করিতেছিল। চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যকালে এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রের সময়ে মগধরাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছিল। মগধরাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব।

যখন শাক্যসিংহ মগধে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মগধ দুইচারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যখন আলেক্‌জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মগধ সাতিশয় উন্নত, সমৃদ্ধ ও প্রবল। এই দুই শত বা আড়াই শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সমবায় হইয়া মগধ-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। কি কারণে এই রাজ্য সকল সমবেত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষে যে রাজ্যের রাজা পরাক্রান্ত, তাঁহার রাজ্যেই প্রজাদিগের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। মগধসাম্রাজ্য অতিপ্রবলপরাক্রান্ত ছিল বলিয়াই প্রজাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও নিরাপদ ছিল। মগধরাজগণ পূর্ত্তাদিকার্য্যদ্বারা প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। মগধরাজ্য তৎকালে ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিল। যখন সেকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্চনদ প্রদেশের রাজগণ তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু মগধের গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল এবং তিনি আর পূর্ব্বদিকে না আসিয়া পঞ্চনদ প্রদেশ হইতেই স্বরাজ্যাভিমুখে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। কিছুদিন পরে আবার যখন সেকন্দরের অন্যতম সেনানী সেলিউকস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনও মগধ

হইতে ভারতরক্ষা হয়। সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মগধ-সাম্রাজ্য না থাকিলে বোধ হয়, ভারতবর্ষ কিছুদিন গ্রীকদিগের অধীনে থাকিত। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবনদিগের আক্রমণের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় সেলিউকসের আক্রমণের কথা। অতএব মগধ হইতে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান উপকার সাধিত হয়। একটী প্রকৃতিদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি। দ্বিতীয়টী বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষের রক্ষাসাধন। যতদিন মগধের বলবিক্রম বিদ্যমান্ ছিল, ততদিন আর কোন বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। মগধরাজ্য হইতে আর একটী উপকার হইয়াছে। তাহা দক্ষিণাবর্ত্তে আধিপত্যবিস্তার। ইহা অশোকরাজের সময়েই ঘটে। অশোক নৃপতির রাজ্যকালে দক্ষিণাবর্ত্তের অনেক স্থান ও সিংহলদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয় এবং তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল, তৈলঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিকমত প্রচার করেন। এইটী মগধসাম্রাজ্যের তৃতীয় উপকার। ইহার বিশেষ বিবরণ এ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। সময়ান্তরে ইহা বিবৃত করিবার অভিলাষ রহিল।

ঐক্ষ্বাক ধর্ম্মবীর

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আর্য্যাবর্ত্তে ধনধান্যসম্পন্ন অতিসমৃদ্ধ কোশল (১) নামে এক জনপদ ছিল। ভুবনবিখ্যাত অযোধ্যা নগরী ইহার রাজধানী। মানবেন্দ্র মনু এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরী দৈর্ঘ্যে ৪৮ ক্রোশ এবং বিস্তারে ১২ ক্রোশ ছিল। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর রাজ্যকালে এই রাজধানী সুপ্রশস্ত রাজপথ ও বহিঃপথসমূহে বিভক্ত এবং চতুর্দ্দিকে তোরণ ও কবাট দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইহার রাজপথ সকল জলসিক্ত হইত। আপণশ্রেণী ইহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। এই রাজধানীতে নানাদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আগমন করিত। এই নগরীতে নানাবিধ বিদ্যার সম্যক্ প্রকারে

---

(১) কোশল দেশ সরযূ বা ঘর্ঘরা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। উত্তর ভাগের নাম উত্তরকোশল এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণকোশল। দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজধানী উত্তরকোশলে ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র লবও উত্তরকোশলে রাজ্য করিয়াছিলেন। বালরামায়ণের ষষ্ঠ অঙ্কে কৌশল্যা দক্ষিণকোশলরাজপুত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দক্ষিণাবর্ত্তে মহাকোশল নামে এক জনপদ আছে। উহা বিদর্ভের নামান্তর। অযোধ্যা নগরী বিশাখা, সাকেত, নন্দিনী, কোশলা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘর্ঘরা ও গোমতী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত। আধুনিক লক্ষ্ণৌ (Lucknow) সহরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মণপুরী। এতদ্দেশীয়গণ ইহাকে লছ্মন্‌পুরী বলেন। লক্ষ্মণদেবের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল।

চর্চ্চা হইত। নানাশাস্ত্রকুশল সত্যবাদী ব্যক্তিগণ এবং ক্ষিপ্রহস্ত সুশিক্ষিত মহারথ বীরগণ এই পুরীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনু সূর্য্যের পুত্র বলিয়া ইক্ষ্বাকুবংশ সূর্য্যবংশ নামে প্রথিত। সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী অযোধ্যা সরযূ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইক্ষ্বাকুবংশে মহাবল পরাক্রান্ত পরমধার্ম্মিক রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশরথ একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং পৌরজানপদগণ তাঁহার সুশাসনগুণে তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তিনি মিথিলা, কাশী, কেকয়, অঙ্গ, মগধ, পূর্ব্বদেশ, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য (১) জনপদের

---

(১) মিথিলা গঙ্গানদীর উত্তরে গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে স্থিত ত্রিহুত প্রদেশ। ইহার মধ্য দিয়া ছোট গণ্ডকা এবং বাঘমতী নদী প্রবাহিত। জনকপুর মিথিলার রাজধানী। মিথি নামে জনৈক রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া মিথিলা নাম হইয়াছে।

কেকয় শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয়ের অন্তরস্থিত প্রদেশ। বাহ্লীক দেশ (Balk) ইহার উত্তর সীমা। কেকয়রাজ্যের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ। ইহা মগধান্তর্গত রাজগৃহ নহে। কনিংহাম সাহেব এবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন কেকয় রাজ্যের বর্ত্তমান নাম হিরাট। অঙ্গদেশ গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল হইতে বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীরে স্থিত। ইহা বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ।

মগধরাজ্যের বর্ত্তমান নাম বেহার। ইহার উত্তরসীমা গঙ্গানদী, দক্ষিণে সিংহভূম, পশ্চিমে বারাণসী এবং পূর্ব্বে হিরণ্যপর্ব্বত বা মুঙ্গের ছিল। পাটলীপুত্র বা কুসুমপুর (পাটনা) ইহার রাজধানী ছিল। মগধরাজ্যমধ্যে বুদ্ধগয়া, ইন্দ্রগয়া, কুক্কুটপদ, রাজগৃহ, কুশাগারপুর, নালন্দ, ইন্দ্রশিলাগুহ প্রভৃতি অনেকগুলি বিখ্যাত নগর ছিল। পলাশ মগধের নামান্তর।

সিন্ধু বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত।

নৃপগণকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে মহারাজের পুত্র-চতুষ্টয় ক্রমশঃ জন্ম গ্রহণ করিলেন। চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রাজমহিষী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন। এই দিন অদ্যাপি রামনবমী বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে। অনন্তর কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভ হইতে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পরম সুখ ও সন্তোষ লাভ করিলেন। রামচন্দ্র যথাকালে নানাবিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বারোহণ, রথচর্য্যা ও ধনুর্ব্বেদ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ শৈশবাবধি সতত রামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগামী হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল।

অবশেষে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং নৃপতিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণানন্তর রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "ভূপতে, আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞে

সৌবীর সৌরাষ্ট্রের উত্তর ও নিষাদের দক্ষিণ কাম্বে উপসাগরের উপকূলে এবং আবুপর্ব্বতের নিকটে স্থিত। বদরী ইহার অপর নাম। বর্ত্তমান সৌবীর রাজপুতানার দক্ষিণাংশ।

সৌরাষ্ট্র বর্ত্তমান গুর্জ্জর দেশ। মালবদেশ হইতে মাহীনদী সৌরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বল্লভী সৌরাষ্ট্রের নামান্তর।

দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই মারীচাদি রাক্ষসগণ উহার বিবিধপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমি মহাবীর রামচন্দ্রকে স্ব-সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আপনি ইহাঁকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আপনি রামচন্দ্রের নিমিত্ত চিন্তিত বা ভীত হইবেন না। দশরথ সাতিশয় ভীত হইয়া রামচন্দ্রকে ঋষির সহিত প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোন মতে তাহা শুনিলেন না। অবশেষে দশরথ রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে অগত্যা সম্মত হইলেন।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে স্ব-সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন। সরযূ নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া বহুদূর গমন করিয়া তাঁহারা গঙ্গা-সরযূসঙ্গমে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য অনঙ্গাশ্রম দর্শনপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূল দিয়া চলিতে লাগিলেন। এই পথে তাঁহারা তাড়কাবনে (৩) উপনীত হইলেন এবং অগস্ত্যের পবিত্র আশ্রম অবলোকন করিলেন। এই স্থলে রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন এবং বিশ্বামিত্রের সকাশে অনেকগুলি দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করেন। তৎপরে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি দীক্ষিত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল, এবং রাক্ষসগণ যজ্ঞব্যাঘাত জন্য আসিয়া

(৩) তাড়কাবন বক্সার নগরের নিকট। বক্সারে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। এই স্থলে তাড়কানালা নামে একটী নালা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

অন্তোমার্গে উপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র আগ্নেয় প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং মিথিলা নগর-দর্শনার্থ রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তর দিকে গঙ্গাতীরে গমন করত তাঁহারা শোণানদী (৪) প্রাপ্ত হইলেন। মগধদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া শোণানদীর আর একটী নাম মাগধী। এই শোণানদীর তীরে গিরিব্রজ নগর (৫) সংস্থাপিত। শোণানদীর তীর দিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহারা গঙ্গার উপকূলে উপনীত হইলেন। এবং নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। জাহ্নবী-তটে উত্থিত হইয়া তাঁহারা বিশালানগরী (৬) নেত্রগোচর করিলেন এবং তথায় এক রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে মিথিলা সীরধ্বজ নামে জনৈক নৃপতির রাজ্য ছিল। মিথিলা-রাজগণের আদিপুরুষ নিমি নামে এক মহীপাল। নিমির

---

(৪) শোণানদী মগধরাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়া পাটলীপুত্র নগরের নিকটে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ইহার বালুকা সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বলিয়া ইহার আর এক নাম হিরণ্যবাহু।

(৫) গিরিব্রজ বা রাজগৃহ মগধের পূর্ব্বতন রাজধানী। পঞ্চগিরিবেষ্টিত বলিয়া গিরিব্রজ নাম এবং রাজধানী বলিয়া রাজগৃহ নাম হইয়াছে। জরাসন্ধ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন।

(৬) বিশালা বা বৈশালী মিথিলার ঠিক দক্ষিণে গঙ্গানদীর তীরস্থিত।

পুত্র নিমি হইতে মিথিলার নাম হইয়াছে। নিমির পৌত্রের নাম জনক। তদবধি মিথিলা-রাজগণ সকলেই জনক নামে অভিহিত হইতেন। মিথিলার আর এক নাম বিদেহ। সীর-ধ্বজ নৃপতির এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম কুশধ্বজ। সীরধ্বজ জনকের সীতা ও উর্ম্মিলা এবং কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে চারি কন্যা ছিল। সীতা বীর্য্যশুল্কা, ইহাঁর বিবাহার্থ জনক এক ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক নৃপতি এই ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই বিফল-প্রযত্ন হইয়া ম্লানমুখে প্রতি-প্রয়াণ করেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সেই ধনু প্রদর্শন করিতে বলিলেন এবং জনকের আদেশে ধনু রামচন্দ্রের সমীপে আনীত হইল। রামচন্দ্র বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে সেই শরাসন অবলীলাক্রমে হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে জ্যা যোজনাপূর্ব্বক আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তখন বিদেহরাজ জনক ধনুর্ভঙ্গব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দশরথের নিকটে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে, ও তাঁহাকে মিথিলায় ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত আসিতে, অযোধ্যানগরে দূত প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে রাজা দশরথ মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং উদ্বাহ-বিধি সমারোহসহকারে সম্পন্ন হইল। রামচন্দ্র সীতার, ভরত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার এবং শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তির, ক্রমান্বয়ে পাণিগ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীমতে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, দশরথের তনয়গণ তিনবার

অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন, এবং পরদিন প্রভাতে পিতার সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলান্তক জটামণ্ডলধারী ভৃগুনন্দন পরশুরাম স্কন্ধদেশে পরশু, করে প্রখর শর ও তাম্বর শরাসন ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে আবির্ভূত হইলেন। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলিলেন "রাম। আমি তোমার অদ্ভুত অবদানসমূহ ও ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার এই ভীষণ শরাসনে শরযোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও নিজবল প্রদর্শন কর। এই কার্য্যে তোমার বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" রামচন্দ্র ভার্গবের এই দৃপ্ত বাক্য শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উহাঁর কর হইতে সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে গুণযোগ ও বাণযোজনা করিয়া উহাঁর বলদর্প চূর্ণ করিলেন। ভার্গব পরাভূত হইয়া মন্দর পর্ব্বতে (৭) প্রস্থান করিলেন এবং রামচন্দ্র জয়োল্লাসে সকলের সহিত রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পৌরকার্য্যসমূহ পর্য্যালোচনা, এবং যত্নের সহিত পুরবাসীদিগের প্রিয় ও হিতকর বিষয় সকল অনুষ্ঠান, করিতে লাগিলেন। সকলেই রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র

(৭) মন্দর পর্ব্বত ভাগীরথীর নিকটে ভাগলপুর হইতে ন্যূনাধিক ত্রিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত। ইহা একটী তীর্থস্থান।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাম-চন্দ্র এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ নানাবিধ সুখভোগে অতীত করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহার এইরূপ চরিত্র দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। প্রজাবৃন্দ রামচন্দ্রের বল বীর্য্য, লোকানু-রাগিতা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সাধুতা ও সত্যশীলতা দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই তাঁহাকে যুবরাজ করিতে সম্মত হইল। রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিবার সমস্ত আয়োজন এবং দিন স্থির হইল। এই সংবাদ শ্রবণে সপত্নীহৃদয়া কৈকেয়ী রাজা দশরথকর্ত্তৃক পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত দুই বর এক্ষণে প্রার্থনা করিলেন। কৈকেয়ী এক বরদ্বারা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস, এবং অপর বর দ্বারা স্বপুত্র ভরতের রাজ্যে অভিষেক, রাজার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ পূর্ব্বে দুই বর দিবেন স্বীকার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই দুই ভয়ঙ্কর বর শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। রামচন্দ্র পিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া এবং কৈকেয়ীর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতৃসত্য-পালনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজবেশ পরিহারপূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিয়া অযোধ্যা হইতে বনবাসার্থ বহির্গত হইলেন। রাজকুল এবং প্রজাবর্গ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। পুত্রশোকে দশরথ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পুরী অরাজক হইল। বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণ ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় হইতে আনয়ন

করাইয়া মৃত রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন, এবং ভরতকে রাজ্য শাসন করিতে বলিলেন। কিন্তু ভরত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোনমতেই তাহা স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ভরত স্থির করিলেন যে বনে রামচন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অযোধ্যায় পুনর্ব্বার আনিবেন।

এ দিকে রামচন্দ্র বনবাসে বহির্গত হইয়া প্রথমে অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া তমসাতটে (৮) উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন কোশল দেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। দেবশ্রুতি, গোমতী, ও স্যন্দিকা নামে তিনটী নদী পার হইয়া রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাতীরস্থিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে (৯) গমন করিলেন। শৃঙ্গবেরপুর নিষাদরাজ্যের রাজধানী, গুহনামক জনৈক রাজার শাসিত। গুহের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা ছিল। নিষাদাধিপতি গুহ তাঁহার সম্যক্ সমাদরপূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথা হইতে তরণীযোগে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ উপকূলে উত্তীর্ণ হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া বৎসদেশে (১০) উপস্থিত হইলেন। সে স্থান

---

(৮) তমসা নদী (Tonse) প্রয়াগের কিছুদূর নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৯) শৃঙ্গবেরপুর নিষাদ-রাজ্যের (Bhil country) রাজধানী ছিল। ইহা কোশল রাজ্যের সীমান্ত নগর। বর্ত্তমান নাম সঙ্গুর (Sungroor)। আধুনিক ভিল জাতিরা (Bhils) গুহের বংশোৎপন্ন।

(১০) বৎসদেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রয়াগের পশ্চিমে স্থিত। রাজধানী কৌশাম্বী বা বৎসপত্তন। রত্নাবলী নাটিকা এই স্থানে প্রথম অভিনীত হয়।

হইতে তাঁহারা প্রয়াগাভিমুখে (১১) গমন করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে আসিয়া উপনীত হইলেন। গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ভরদ্বাজাশ্রমে তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহারা ঋষির উপদেশানুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতের (১২) দিকে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গমতীর্থে গমনপূর্ব্বক তাঁহারা পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অল্পদূরে এক তীর্থ দেখিতে পাইলেন। সেই তীর্থ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা কাষ্ঠনির্ম্মিত উড়ুপ দ্বারা যমুনা পার হইয়া দক্ষিণতটে উত্তীর্ণ হইলেন। তত্রত্য বনপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রসিদ্ধ শ্যামবটের সন্নিহিত হইলেন। তথা হইতে কিয়ৎকাল পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা চিত্রকূটে আগত হইলেন এবং বাল্মীকিমুনির আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। চিত্রকূটের সমতল রমণীয় কাননে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা তথায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ভরত পৌর জানপদগণের সহিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং রামচন্দ্রের পদতলে নিপতিত হইয়া পিতা দশরথের মৃত্যু-সংবাদ নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অযোধ্যায়

---

(১১) প্রয়াগ বর্ত্তমান এলাহাবাদ।

(১২) চিত্রকূট বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বন্দ (Banda) নগরের ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব পিশুনী-নদী-তীরস্থ পর্ব্বত। পূর্ব্বে বাল্মীকির আশ্রম এই স্থানে ছিল, পরে কাণপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে বিঠুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণের কোন কোন টীকাকার বলেন, এই বাল্মীকি আদি ঋষি বাল্মীকি নহেন।

প্রতিপ্রয়াণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে শোকাকুল হইলেন, কিন্তু কিছুতেই অযোধ্যায় প্রতিগমন স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল গ্রহণপূর্ব্বক উহা সম্মুখে স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে নন্দিগ্রামে রাজ্যশাসন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে নাস্তিক-বুদ্ধি উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ধর্ম্মবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জাবালিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক বলিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতকে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। অযোধ্যাবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাঁহার আর চিত্রকূটে বাস করিতে ভাল লাগিল না। ঋষিগণ আসিয়া তাঁহাকে রাক্ষসদিগের উপদ্রবের কথা নিবেদন করিলেন। তখন তিনি চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে (১৩) প্রবেশ করিলেন। দণ্ডকে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্র তাপসগণের পুণ্যাশ্রম সকল দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগের আশ্রমে উত্তমরূপ সৎকৃত ও সমা-

---

(১৩) দণ্ডকারণ্য যমুনানদীর দক্ষিণ তীরে গোদাবরী নদী-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দণ্ডনামক কোন রাজার নামানুসারে ইহার নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে। এই অরণ্যে অসভ্য জাতিরা বাস করিত এবং রামায়ণের সময়ে ঋষিদিগের আশ্রম নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

দৃত হইয়া, তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বনপ্রবেশ করিলেন। এই বনে বিরাধ নামে এক রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে সেই রাক্ষসকে নিপাত করিয়া শরভঙ্গের আশ্রম (১৪), সুতীক্ষ্ণের আশ্রম প্রভৃতি অনেক ঋষির পুণ্যাশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে বনবাসের দশ বৎসর অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্য ঋষির উপদেশ-মতে গোদাবরীতটে পঞ্চবটী বনে (১৫) পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রামায়ণ-যুদ্ধের প্রথমাঙ্ক এই স্থলে অভিনীত হয়। একদা রাবণের ভগিনী শূর্পণখা নামে নিশাচরী রামচন্দ্রের পর্ণকুটীরে যদৃচ্ছা-ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। শূর্পণখা রামচন্দ্রকে বিবাহ করিবার বাসনা ব্যক্ত করিল এবং সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সে রোদন করিতে করিতে জনস্থানে (১৬) গমন করিল এবং তাহার ভ্রাতা খরের সমীপস্থ হইয়া আপনার অপমান নিবেদন করিল। খর ক্রোধান্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রকে

---

(১৪) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বন্দ প্রদেশের (Banda Bistrict) প্রান্ত সীমায় স্থিত। উহা অদ্যাপি শরভঙ্গাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রি ও সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম বন্দ প্রদেশের অন্তর্গত।

(১৫) পঞ্চবটী বোম্বাই নগরের ৩৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গোদাবরী নদী তটে স্থিত বর্ত্তমান নাসিকনগর (Nasik)। এ স্থানে শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন হয় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম নাসিক হইয়াছে।

(১৬) জনস্থান পঞ্চবটীর দক্ষিণে স্থিত প্রদেশ।

আক্রমণ করিল, কিন্তু রণে পরাজিত এবং সগণে নিহত হইল। অকম্পন নামে একটী মাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে লঙ্কা নগরীতে (১৭) উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। আর শূর্পণখা রাবণকে সীতার কথা বলিয়া প্রতি-হিংসাতে সমধিক উৎসাহিত করিল। তখন রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্যে গোপনে রাম ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে সীতাকে হরণ করিয়া নিজ রাজধানী লঙ্কাতে লইয়া গেল। সীতার অদর্শনে রামচন্দ্র বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে লক্ষ্মণের চেষ্টায় তাঁহার সংজ্ঞা-লাভ হইলে তিনি নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন। অব-শেষে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়দ্দূর দক্ষিণে গমন করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে (১৮) উপস্থিত হইলেন। তথায় বানররাজ সুগ্রীবের নিকট সীতার নিক্ষিপ্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিলেন এবং সুগ্রীবের বিপক্ষ ভ্রাতা বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য (১৯) প্রদান করিলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রের অনুগ্রহে রাজ্য লাভ করিয়া সীতান্বেষণার্থ বানর-দূত চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। যাহারা দক্ষিণ দিকে গমন

---

(১৭) লঙ্কা সিংহল দ্বীপের (Ceylon) রাজধানী। সিংহল দ্বীপের অন্যান্য নাম তাম্রপর্ণি, রত্নদ্বীপ ও লঙ্কাদ্বীপ। রামায়ণে, লঙ্কা ভিন্ন নামান্তর দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

(১৮) কিষ্কিন্ধ্যার পর্ব্বত বিশেষ।

(১৯) কিষ্কিন্ধ্যা মৈসুর (Mysore) রাজ্যের উত্তরস্থিত প্রদেশ।

করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে হনুমান্ নামে এক মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইল। লঙ্কাই রাবণের সুসমৃদ্ধ রাজধানী। লঙ্কাপুরীর রাজপথ সকল প্রশস্ত ছিল, সর্ব্বত্র প্রাসাদপুঞ্জ শোভা পাইত। কোন স্থানে সাপ্ত-ভৌমিক ভবন, কোন স্থানে অষ্টতল ভবন, এবং কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে মণ্ডিত। পুরীর দ্বার সকল কনকময়, দ্বার-বেদি পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং নানাজাতীয় বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। তোরণ নানা বর্ণে চিত্রিত ও স্বর্ণরঞ্জিত। ইতস্ততঃ উন্নতশিরস্ক অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ সকল দেদীপ্যমান ছিল। পুরী শতঘ্নী (২০), শক্তি, যন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য আয়ুধসমূহে সুরক্ষিত ছিল। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার শোভা পাইত। রাত্রিকালে সর্ব্বত্রই দীপালোক পুরীকে আলোকিত করিত। নানাবিধ রমণীয় উপবন এবং আরাম গৃহ উহা পরি-শোভিত করিত। এই লঙ্কার মধ্যে অশোকবনে সীতা রাম-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দুঃখিতমনে বাস করিতেছিলেন। হনুমান্ সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অশোকবনে প্রবেশপূর্ব্বক সীতার দর্শন প্রাপ্ত হইল। সে তাঁহাকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক আশ্বাসিত করিল এবং লঙ্কায় নিজ

---

(২০) শতঘ্নী আগ্নেয় অস্ত্রবিশেষ। ইহা চক্রের উপর চালিত হইত এবং চালকেরা ইহার গর্ভে গোলক দিয়া শত্রুদিগের উপর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) ব্যবহৃত হইত। একবারে শতলোক বধ করিতে পারিত বলিয়া শতঘ্নী নাম হই-য়াছে। বোধ হয় ইহা একপ্রকার কামান (নালীকাস্ত্র)।

পরাক্রমের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া সমুদ্র পুনর্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের সমীপে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্যে সমস্ত সৈন্য সজ্জিত করিয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নলের সাহায্যে সমুদ্রোপরি এক সেতু বন্ধন করাইলেন। এই সেতু ভারতবর্ষ এবং লঙ্কাদ্বীপকে সংযোজিত করিল। ইহাকে সেতুবন্ধ কহে। সেতুর নির্বিঘ্নতাসিদ্ধির নিমিত্ত রামচন্দ্র ইহার উত্তরমূলে এক শিব স্থাপনা করেন। ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থান। অদ্যাপি দক্ষিণ মহাসমুদ্রে এই সেতুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীকে অধুনা Palk's strait বলে এবং রামচন্দ্রনির্ম্মিত সেতুকে Adam's Bridge বলে। রামচন্দ্র সসৈন্যে এই সেতুর উপর দিয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিকালেই ঐ পুরী অবরোধ করিলেন। তখন রাবণ চিন্তিত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক বিভীষণ রাবণ কর্ত্তৃক অবমানিত ও তাড়িত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীস্থাপন করিলেন। বিভীষণ এই ভীষণ সময়ে রামচন্দ্রের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। সন্ধির সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিন দিন বহুসংখ্যক রাক্ষস ও বানর নিহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষে মধ্যে মধ্যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে রাম ও রাবণের জয়ঘোষণা প্রচারিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ দ্বারা লৌহবদ্ধ লগুড়সমূহ চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ শিলা দ্বারা মুদ্গর সকল নিষ্পিষ্ট

হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসে এইরূপ তুমুল সংগ্রাম বহুদিন চলিয়াছিল। সমরোত্থিত ধূলিপটল রাক্ষস-শোণিত-নদীতে নিপতিত হইয়া বিলীন হইতে লাগিল। এক এক করিয়া সমস্ত রাক্ষসবীর সংগ্রামে আগমন করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে কাল-কবলে পতিত হইল। রাবণের পুত্র মেঘনাদ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করিল; কিন্তু গরুড়ের আগমনে উহা শিথিল হইয়া গেল। রাবণ শক্তি-শেল প্রহারে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল, কিন্তু মহৌষধ-সেবনে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র রাবণের দুর্জ্জয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে এবং লক্ষ্মণ রাবণ-পুত্র মেঘনাদকে সম্মুখ-সমরে বিনাশ করিলেন। বহুদিনপরে যুদ্ধের অবসান হইল (২১)। তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন অর্পণ করিয়া সীতা-সমভিব্যাহারে সগণে ও সসৈন্যে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় আগমন করিবামাত্র ভরত ন্যাসস্বরূপ রাজ্যভার রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিগতজ্বর হইলেন। রামচন্দ্র বনবাসবেশ পরিহারপূর্ব্বক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বযোগ্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। প্রজাগণ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। এই

---

(২১) রামায়ণমতে পঞ্চদশ দিন, কিন্তু পদ্মপুরাণমতে ঊনচত্বারিংশৎ দিন। রামায়ণমতে চৈত্রমাসের অমাবস্যাতে রাবণ বধ ও বৈশাখ-শুক্লষষ্ঠীতে নন্দিগ্রামে রামচন্দ্রের আগমন। পদ্ম ও কালিকাপুরাণমতে আশ্বিন-শুক্লনবমীতে রাবণ বধ এবং দশমীতে ব্রহ্ম-প্রমুখ সুরগণকৃত নবাহ দুর্গার পূজার পর ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জন।

সময়ে রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম একচত্বারিংশ বৎসর এবং সীতার চতুস্ত্রিংশ বৎসর।

অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র সীতার সহিত পরম সুখে কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও সন্তুষ্ট ছিল। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা ছিল না; অগ্নিভয়, প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল; নগর ও রাষ্ট্রসকল ধনধান্যসম্পন্ন ছিল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ নিরন্তর সুখে কালহরণ করিত। এইরূপে জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মশীল ও সুশীল; রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ; ধনুর্ব্বেদ তাঁহার অধিকৃত; সাধুগণের উপকার ও সৎকার্য্যের প্রচার তাঁহার অভ্যস্ত; এবং প্রজাপালন তাঁহার প্রিয়ব্রত ছিল। তিনি তেজস্বিতায় সূর্য্যকে, ক্ষান্তিগুণে সর্ব্বংসহা পৃথিবীকে, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতিকে, এবং কীর্ত্তিতে সুরপতিকে, অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের পূজিত, প্রজাবৃন্দের অভ্য-র্চ্চিত, এবং ভ্রাতৃগণের আরাধিত, ছিলেন। তিনি সত্যধর্ম্ম-নিরত, দেশকালজ্ঞ এবং প্রিয়বাদী ছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ, প্রমাণ চারি হস্ত, এবং সর্ব্বাবয়ব সুরূপ ও সবল। এই রাজ্যকালে সীতা কুশ ও লব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। ইতিমধ্যে যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ লবণাসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে শরণার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে লবণবধার্থ নিয়োজিত করিলেন। আদেশ মাত্র শত্রুঘ্ন সুসজ্জিত হইয়া

লবণ-পুরীতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধে লবণাসুরকে নিহত করিয়া কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে (২২) এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। শত্রুঘ্ন শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামক পুত্রদ্বয়কে মথুরা ও বিদিশার (২৩) আধিপত্য প্রদান করিয়া রামদর্শনোৎসুক হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। নিমন্ত্রিত ঋষিগণ এবং পার্থিবগণ নানাদিগ্‌দেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে ভূরিদক্ষিণ বাজিমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, এবং রামচন্দ্র যজ্ঞান্তে সরযূতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিলেন। তিনি যজ্ঞাবসানে ঋষিবর্গ ও সুহৃদ্‌গণকে পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিয়া রাজ্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রজাপালক রামচন্দ্র কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শরাবতীতে (২৪) সংস্থাপিত করিলেন। ভরতের পুত্রদ্বয় তক্ষ ও পুষ্কর সিন্ধুরাজধানীতে অভিষিক্ত

---

(২২) পঞ্চাল ও মৎস্য দেশের মধ্যস্থিত মথুরাপ্রদেশের রাজধানী। কংসরাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। কৃষ্ণের পিতামহ শূরসেন মথুরাপ্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহার শৌরসেন নাম হইয়াছে। মথুরাপুরী যমুনার তীরে স্থিত। বৃন্দাবন ইহার তিন ক্রোশ উত্তর।

(২৩) মালবদেশে বেত্রবতী নদীর তটে স্থিত বিদিশা দশার্ণ প্রদেশের রাজধানী। বর্ত্তমান নাম ভিল্‌সা (Bhilsa)। এখানে অত্যুৎকৃষ্ট ভ্যাল্‌সা তামাক প্রস্তুত হয়।

(২৪) কুশাবতী বা কুশস্থলী দক্ষিণ কোশলার রাজধানী, বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরি প্রতিষ্ঠিত। শরাবতী বা শ্রাবস্তী উত্তর-কোশলান্তর্গত। সিন্ধুদেশের তক্ষশিলা তক্ষের এবং পুষ্করাবতী পুষ্করের রাজধানী ছিল।

হইলেন। লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয় অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু কারাপথের (২৫) আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। রামচন্দ্র এইরূপে পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ পতি-লোকগত জননীদিগের শ্রাদ্ধাদি সমাধা করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ মানবলীলা সংবরণ করিলেন এবং কিছু দিন পরে রামচন্দ্র, ভরত ও শত্রুঘ্ন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে রাম-চন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে তাহাতে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। আমরা সেই অংশটুকুও উদ্ধৃত করিলাম। ভগবান্ বিষ্ণু ভূভারহরণার্থ অংশ-চতুষ্টয়ে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে অভিহিত হন। রামচন্দ্র বাল্যকালে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যা-হারে যজ্ঞ-বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত গমন করিয়া তাড়কা-নাম্নী এক রাক্ষসীর প্রাণ সংহার করেন। যজ্ঞস্থলে তাঁহার নিদারুণ শরপ্রহারে রাক্ষসগণ নিহত এবং দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে তিনি মিথিলায় রাজর্ষি জনকের গৃহে উপস্থিত হইয়া হর-ধনু ভগ্ন করিয়া জনকতনয়া সীতার পাণিপীড়ন করেন। পরি-ণয়ানন্তর অযোধ্যাভিমুখে আগমনকালে তাঁহার নিকটে ক্ষত্রিয়কুলান্তক হৈহয়কুলের ধূমকেতুস্বরূপ মহাবীর পরশু-রামের দর্প চূর্ণ হয়। অনন্তর তিনি রাজ্যাভিলাষ তুচ্ছ করিয়া

(২৫) কারাপথদেশ হিমালয়ের সন্নিহিত। অঙ্গদের রাজধানী অঙ্গদা ও চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রবক্ত্রা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল।

পিতৃসত্য পালন করিতে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করেন। দণ্ডকারণ্যে লঙ্কাধিপতি দশাননকর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হইলে তিনি খর-দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে এবং বালীকে বিনাশ করিয়া সাগর বন্ধনপূর্ব্বক অবশেষে রাক্ষসকুল ধ্বংস করত সীতাকে উদ্ধার করেন। জনকনন্দিনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অনলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ শুদ্ধ চরিত্রের পরীক্ষা প্রদান করিলে তিনি দেবগণের অনুরোধে তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পৃথিবীর স্থিতি-সাধনের জন্য দুষ্টগণের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে স্বর্গারোহণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণের রচনা রামায়ণের বহুকাল পরে হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমরা রামচন্দ্রের দেবভাব দেখিতে পাই-লাম। বাল্মীকি এই পৌরাণিক অবতার বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী লেখকেরা তাহা জানিতে পারিয়া-ছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় কীর্ত্তন করিত এবং কালক্রমে দেবভাব আরোপ করি-য়াছে। অবশেষে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হিন্দুসমাজ অদ্যাপি তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করে। ইহা কেবল তাঁহার প্রতি জনসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে তিনি জনসমাজে এতদূর আদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন যে সমাজের লোকেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকার করিয়াছিল এবং তদবধি তিনি সেই ভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী এতক্ষণে শেষ হইল। ইহা সংকলন করিতে আমরা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রচারিত রামায়ণ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে রামচন্দ্রের সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রামায়ণের প্রথমে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। রামায়ণে ও পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, রামচন্দ্র অযোধ্যাতে দশ সহস্র এবং দশশত বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। রামায়ণের এই দুইটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। লিঙ্গপুরাণ ও বায়ুপুরাণে দশসহস্র বৎসর রামচন্দ্রের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবনীতে আমরা দেখিতেছি যে, রামচন্দ্রের পঞ্চদশ বর্ষের শেষে বিবাহ হয়। তৎপরে দ্বাদশ বর্ষ অযোধ্যায় বাস করিলে তিনি বনবাসে গমন করেন, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করেন। সুতরাং রামচন্দ্র যখন রাজ্য-গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একচল্লিশ বৎসর। তৎপশ্চাৎ তিনি বহুদিন রাজ্যশাসন করিয়া দেহত্যাগ করেন। ইহাতে কিছু একাদশ সহস্র বৎসর হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি যে, যুধিষ্ঠির ১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্রেরও তদনুরূপ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রসমূহ একবাক্যে রামচন্দ্রকে ত্রেতাযুগের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। ত্রেতা-যুগের পর দ্বাপরযুগ ও দ্বাপরযুগের পর কলিযুগ। কলিযুগের অষ্টম শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হয়। রামায়ণ মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে লিখিত হয়। বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন এবং তৎপ্রণীত রামায়ণ রামচন্দ্রের সভাতে গীত হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের চরিত্র পবিত্র ও নির্ম্মল। বাল্মীকি ইহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র এতদূর সমভাবে নিঃস্বার্থ ও পরহিতব্রত, যে তাঁহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার বীরত্ব, ঔদার্য্য, কর্ত্তব্যানুরাগ এবং ধর্ম্মপ্রবণতা সর্ব্বজনের আদরণীয় এবং অনুকরণীয়। তাঁহার সৎসাহস, পিতৃমাতৃভক্তি, পবিত্র প্রণয়, প্রগাঢ় ভ্রাতৃস্নেহ এবং সমদর্শিতা অতিশয় প্রশংসার বিষয়। যখন তিনি অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন তাঁহার মনে অসন্তোষ বা ক্রোধের লেশমাত্র উদিত হয় নাই। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। জীবনীর মধ্যে তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সীতার চরিত্র অতি মনোহর। তিনি পতিদেবতা ও পতিপ্রাণা। তিনি সর্ব্বংসহা —সহিষ্ণুতাগুণের নিদর্শনভূতা পৃথিবীর এবং শ্রীরও শ্রী। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রণয়, অচল পতিভক্তি, অটল ধৈর্য্য এবং মহীয়সী সহিষ্ণুতা কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহের এবং দশরথ ও কৌশল্যা পুত্রবাৎসল্যের উজ্জ্বল আদর্শ। রামায়ণের নীতি অতি উন্নত ও পবিশুদ্ধ। ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায় যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পর্ব্বত এবং নদী সকল বিদ্যমান রহিবে, সে পর্য্যন্ত রামচরিত লোকে প্রচলিত ও আদৃত থাকিবে। অধুনা জর্ম্মন প্রদেশে নরনারীগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাম ও সীতার নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। হিন্দুগণ রামচরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে কখনই বিরত থাকিতে পারিবেন না।

রামচন্দ্রের প্রতি হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাম-নবমী সুপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যে নবমী তিথিতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই রামনবমী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দুসমাজের একটী মহোৎসবের দিন। যতদিন হিন্দুসমাজের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে, ততদিন রামনব-মীতে হিন্দুদিগের মহোৎসব হইবে এবং ততদিন রামচন্দ্রের নাম হিন্দুদিগের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত জাগরূক থাকিবে।

রামচন্দ্র কোন্ সময়ের লোক, জিজ্ঞাসা করিলে আমরা যে কি বলিব তাহা স্থির করিতে পারি না। যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্ণয় করা সহজ, কিন্তু রামচন্দ্রের সময়নিরূপণের কোন অবলম্বন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে যে রামচন্দ্র সূর্য্যবংশের ষট্পঞ্চাশত্তম নৃপতি এবং বৃহদ্বল ষড়শীতিতম নৃপতি। বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিহত হন। অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ রামচন্দ্রের ত্রিংশৎ পুরুষের রাজত্বের পর ঘটিয়াছিল। এই ত্রিংশৎ পুরুষে অন্যূন ১০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা তাঁহাদের ন্যায় প্রতি পুরুষে ২০ বা ১৬ বৎসর ধরিতে পারি না। ত্রেতাযুগের লোক কলিযুগের লোক অপেক্ষা দীর্ঘায়ু ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কলিযুগের ৭৪২ অব্দ গত হইলে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৩৬০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্র এই সময়ের অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। দক্ষিণাবর্ত্তবাসী তামিলগণ বলিয়া

থাকেন যে, রামচন্দ্র কিঞ্চিদধিক পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুমারিকাতে রামেশ্বর দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রামচন্দ্রের রাজত্ব কাল ৩৩৬০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা বর্ত্তমান সময় হইতে ৫২৪১ বৎসর পূর্ব্বতন। ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তখন সবে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অযোধ্যানগরীতে তখন ৫৬ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। এক সহস্র বৎসর আমরা অতি ন্যূন সংখ্যা ধরিয়া গণনা করিলাম। যতক্ষণ ইহার প্রতিকূলে বলবত্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ ইহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় দামোদর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে তাঁহারা রাজাকে এক দিবসে সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ করিতে আদেশ করেন। রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদক ট্রয়ার সাহেব নিজ গণনা দ্বারা কাশ্মীরের রাজা তৃতীয় গোনর্দ্দের সময় ১১৮২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দামোদর এবং তৃতীয় গোনর্দ্দের মধ্যে পাঁচ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। সুতরাং দ্বিতীয় দামোদরের সময় অন্ততঃ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইবে। অনেকে প্রতি রাজার রাজত্বকাল ২০ বৎসর গণনা করেন, কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারি না। যদি ট্রয়ার সাহেব এইরূপ গণনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কাল নির্ণয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আমাদের অভিমত নহে; চতুর্দ্দশ শতাব্দী না হইয়া আরও প্রাচীন হইবে। এই সময়ে রামায়ণ প্রচলিত ছিল দেখিয়া আমরা রামায়ণের সময় নিরূপণ

করিতে পারি না। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় দামোদরের পূর্ব্বতন পঞ্চ নৃপতির প্রথম জনের রাজত্ব সময়ে রামায়ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা কিরূপে জানিতে পারা যায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি উল্লেখ না থাকিলেই অনস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তবে ত ভয়ানক কাণ্ড হইয়া উঠে। রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত আভাস আমাদিগের নিরূপিত সময়ের কোন রূপেই প্রতিকূল হইতেছে না। আমরা রামচন্দ্রের রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছি এবং অন্য বলবত্তর প্রমাণাভাবে উহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।

নাস্তিকত্রাস ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্যের জীবনী।

জীবনচরিত পাঠ করিতে সকলেই ভাল বাসেন। ইহার হেতু এই যে, জীবনচরিত দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। যাঁহার জীবনী লিখিত হয়, তিনি কিরূপে সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সমাজের কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন সাধন (যদি করিয়া থাকেন) করিয়াছিলেন, কিরূপে বিবিধ-মতাবলম্বী লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন, কিরূপেই বা সংসারের নানা প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা সাধারণ জনগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন,

ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হয়, এবং আগ্রহ জন্মে। জীবনবৃত্ত-পাঠে অনেকে বিশেষ-রূপে উপকৃত হইয়াছেন, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজের দোষপ্রভৃতি সংশোধনপূর্ব্বক উন্নতি বিধান করিয়াছেন এবং সমাজে প্রশংসনীয় ও গণনীয় হইয়াছেন। অতএব জীবন-চরিতের উপকারিতা প্রভূত। আবার যদি এই জীবনচরিত কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বাং-শেই ঔৎসুক্যজনক হয়। মহাপুরুষের নাম-শ্রবণে হৃদয়ে একটী ভয়-ভক্তি-সংবলিত প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপুরুষদিগের সম্মান, আদর এবং পূজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এটী মহাজন-গৃহীত বাক্য, এইটী মহাজনের উক্তি, এটা মহাপুরুষের কথা, এইটী মহাপুরুষের আচার—এই কথা বলিলে লোকের মনে অতিশয় সম্মান-ভাবের উদয় হয়। অতএব মহাপুরুষের জীবনচরিত আরও অধিক প্রীতিকর ও রুচিকর। যখনই কোন সমাজের অবস্থা ঘটনাচক্রের পরিভ্রমণে এরূপ হইয়া উঠে যে, যদি কোন মহাপুরুষ সে সময় আবির্ভূত না হন এবং সমাজের অবনতির প্রতিরোধ না করেন, তবে সমাজ বিচ্ছিন্ন এবং শিথিলবন্ধন হইয়া যাইবে; তখনই সেই সমাজের রক্ষার নিমিত্ত একজন মহাপুরুষ উদিত হন। যৎকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্যায়রূপে ব্যবহৃত প্রভাব দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তৎকালে কপিলবস্তু নগরে সমাজ-সংস্কারার্থে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজসংস্কার কার্য্যে

আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রথম বুদ্ধি-বিপ্লবের আবহন করিয়াছিলেন এবং সমাজের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবনীশক্তি পুনঃপ্রদান করিয়াছিলেন। যৎকালে জেরু-জেলাম (Jerusalem) নগরে ফারিসি (Pharisees) এবং সাডিউসি (Sadueees) নামে দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কৌটিল্য, অন্তরে বাহিরে দ্বিভাব, এবং লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে সমাজ অধঃপাতে যাইতেছিল এবং যৎকালে আন্তরিক হৃদয়ের কিছুই না থাকিয়া কেবল-মাত্র বাহ্য আড়ম্বরের ঘোর ঘটা সমাজকে রসাতলে দিতেছিল, তৎকালে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে যখন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা, অন্যায় আধিপত্য ও বলপ্রয়োগ, রোম-নগরস্থ পোপ (Pope) নামা ধর্ম্মাধ্যক্ষের অসহ্য অত্যাচার, এবং অন্যান্য গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান সমাজের অধোগতির সূত্রপাত করিতেছিল, তখন মার্টিন লুথার নির্ভীকচিত্তে সমস্ত কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে সজীব করিলেন এবং বিবেকশক্তির সুচালনার ঐকান্তিক ঔচিত্য প্রচার করিলেন। লুথার যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে খৃষ্টান সমাজের যৎপরোনাস্তি অমঙ্গল ঘটিত। তিনি সম্রাট্-সমূহ-সেবিত সভামধ্যে স্বমত বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে ভীতিরহিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "এই আমি কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলাম; আমি নিজ বিবেকের উপদেশ অবহেলন করিতে পারিব না। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।" ইহা কি সামান্য মনের কথা !!

এইপ্রকার যখন যখন সমাজের রক্ষার নিমিত্ত মহা-

পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে, তখন তখনই আমরা দেখিয়াছি যে একজন না একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন। অধ্যবসায়, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, মনস্বিতা, সম্পূর্ণ নির্ভীকতা প্রভৃতি মহাপুরুষের লক্ষণ। স্কটলণ্ড-দেশীয় বিখ্যাত সংস্কারক জন নক্সের (Knox) সমাধিকালে আরল্ অব মর্টন (Earl of Morton) বলিয়াছিলেন "ঐ ব্যক্তি কখন মনুষ্যের মুখকে ভয় করে নাই।" হিউ লাটিমার (Hugh Latimer), টমাস্ ক্রান্মার (Thomas Cranmer), জন কাল্‌বিন্ (John Colvin) প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কারকগণের আবির্ভাব ঠিক উপযুক্ত কালেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও রামানুজ, কবীর, দাদূ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি কত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ উদিত হইয়াছেন। সে দিনও বঙ্গীয় সমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নির্জ্জীবতা দূর করিবার নিমিত্ত রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতএব ইহা প্রদর্শিত হইল যে, যৎকালেই সমাজের রক্ষার্থে মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হয়, তৎকালেই কোন না কোন মহাপুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া সমাজকে অব্যাহত অবস্থায় রক্ষা করেন।

ভারতবর্ষের দুইটী বিশেষ গৌরবের সময়। প্রথমটী যখন বুদ্ধদেব প্রথম বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টী যখন শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমতের প্রচার করিয়া সমাজের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই নাস্তিকত্রাস প্রাতঃস্মরণীয় শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিবার জন্যই আমরা এত কথা বলিলাম। ইনি অদ্বৈতমতের প্রচারক। ইনি মঠাশ্রমের প্রবর্ত্তয়িতা। ইনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেবতা বলিয়া মান্য, গণ্য এবং

পূজনীয়। ইনি ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইনি বহুসংখ্যক অদ্বৈতমতবিরোধি মত নিরাকরণপূর্ব্বক সত্য অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইহাঁকে শৈব বলিয়া লোকে পূজা করে, কিন্তু ইনি শৈবমত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমত প্রচার করেন। ইহাঁর দশজন প্রধান শিষ্য হইতেই ইহাঁর অদ্বৈত মতের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়ে। আমরা এই সমস্ত যথাস্থানে সবিশেষ বর্ণনা করিব।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে তদ্বিষয়ক গ্রন্থনিচয়ের আশ্রয় লইতে হয়। একরূপ প্রবাদ যে, তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসমস্ত এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকার প্রথিতনামা আনন্দগিরি স্বীয় আচার্য্যের জীবনী এবং দিগ্বিজয় (অর্থাৎ স্বমতপ্রচার ও বিরুদ্ধমতখণ্ডন) স্বকৃত শঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থে বহুলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং ইহা প্রামাণিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যেহেতু আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং তৎসাময়িক লোক। আর ধর্ম্মভয়ে আনন্দ নিজ গুরুর জীবন-চরিত মিথ্যা-কল্পনা-দোষাক্রান্ত করেন নাই; তবে তাঁহার বিশ্বাস এবং তাৎকালিক আচারের অনুরোধে কতকগুলি আতিশয্যদ্যোতক বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুপরম্পরাশ্রুত প্রবাদ অনুসারে ইহা দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহা গদ্যেই বিবৃত, মধ্যে মধ্যে পদ্য নিবেশিত হইয়াছে। ইহা চতুঃসপ্ততি প্রকরণে সম্পূর্ণ।

আচার্য্যের জীবন-চরিত বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ মাধবাচার্য্য-প্রণীত শঙ্কর-দিগ্বিজয়-নামক মহাকাব্য, ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। মাধবাচার্য্য পাঁচ শত বৎসরের লোক। ইনি বিজয়নগরের বুক্কভূপের সচিব সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা। ইহাঁরা দুই ভাইই অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে স্বশিষ্যদিগের সাহায্যে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে দর্শনসমূহের সারাদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শঙ্করদিগ্বিজয়ের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, আমি শঙ্করবিজয়ের সারসংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।(১) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, পুরাণ কবিরা শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য মাধবাচার্য্যের বহুকাল পূর্ব্বের লোক। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-বিষয়ক তৃতীয় গ্রন্থ কেবলোৎপত্তি। ইহা তেলুগু ভাষায় রচিত। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের বাল্যকালের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন বেঙ্কটরামস্বামী দক্ষিণদেশীয় কবিদিগের যে জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে এবং আচার্য্য-প্রণীত শারীরকভাষ্য প্রভৃতি হইতে আমরা আচার্য্যের জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছি।

---

(১) শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থের সারসংকলন করিয়া সুকবি সদানন্দ "দিগ্বিজয়সার" রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে শঙ্কর-জীবনী বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিতে পারা যায় না। ইহার "শঙ্কর-বিজয়জয়ন্তী" নামে বঙ্গভাষায় একখানি অনুবাদ আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ এই প্রভাব ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচার আরম্ভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণতার কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বেদ এবং ঈশ্বর মানিত না। ভারতের সর্ব্বত্রই বেদের এতদূর সম্মান এবং এতদূর আদর যে, সাংখ্যদর্শনকার কপিলঋষি বেদের নিত্যতা এবং প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যদি বেদের দোহাই দিয়া নিজ মত প্রচার করিতেন এবং ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম কখন ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত না। কেবল ঈশ্বর এবং বেদের নাম করিয়া তিনি অক্লেশেই স্বমত প্রচার করিতে পারিতেন। আর বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসকদিগের নিয়ম সকল অতিশয় কঠোর ছিল বলিয়া সকলে তদনুসারে চলিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের জাঁকজমক এবং লোক-চিত্তাকর্ষক আড়ম্বর কিছুই ছিল না। বৌদ্ধ পুরোহিতেরাও ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, ভ্রষ্টচরিত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ইত্যাদি নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইলে পর ব্রাহ্মণেরা পুরাণ প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কথকতা দ্বারা তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম সমাজে বোধগম্য করাইতে লাগিলেন এবং সকলেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। কথকেরা নিজ বাগ্মিতার দ্বারা লোকের

মনোহরণ করিতে লাগিলেন। লোকে বুঝিতে পারিল যে, যে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বকার্য্যেই ঈশ্বরের নাম করা হয়, সে হিন্দুধর্ম্ম অবশ্য শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহণীয়।(২) এবম্প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার প্রচার হইল তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিকৃত ভাব, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। বেদবোধিত সত্যজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা পরস্পর রাগাদিগ্রস্ত এবং সত্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া বৈদিকাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মার্গগামী হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। এই সামাজিক অবস্থা আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে দ্বিতীয় প্রকরণে উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত আছে, আমরা সেই কবিতা-গুলির পদ্যে অনুবাদ নিম্নে নিবেশিত করিতেছি।

কেহ পূজা করে শম্ভু, কেহ পূজে হরি।
কেহ অর্চ্চে বাণী, কেহ নানাচিহ্নধারী॥
কোন জন পূজে বহ্নি, কেহ দিবাকর।
কেহ বা গণেশদেব, কেহ শক্তিপর॥

---

(২) "ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥"

কেহ বা ভৈরব সেবে, কেহ বিশ্বক্সেন।
মল্লারি কেহবা পূজে, কেহ বা মদন॥
কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ সবিৎপতি।
উদক, অম্বর, বায়ু, পৃথিবীপ্রভৃতি॥
কেহ পূজে অর্থপতি, কেহবা ব্রহ্মাবে।
যথেচ্ছায় গুণত্রয় অর্চ্চনা বা করে॥
সাংখ্যমতে কেহ বা প্রকৃতিপরায়ণ।
কর্ম্মশীল অণু মান্য করে কোন জন॥
কেহ সোম, কেহ কুজ, কেহ সোমসুত।
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নানামতযুত॥
কেহ সেবে কালদেব, কেহ পিতৃগণ।
অনন্ত, গরুড়, কেহ সিদ্ধ অগণন॥
কেহ বা গন্ধর্ব্ব ভজে, কেহ সাধ্যগণ।
পূজে ভূত কিংবা করে বেতাল অর্চ্চন॥

এইরূপ নানাবিধ লোকেরা যথেচ্ছাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহারা মৎসরতা, জিগীষা, এবং নিজেচ্ছাকৃত লিঙ্গ, ত্রিশূল, ডমরু, শঙ্খ প্রভৃতি বিবিধ চিহ্নধারণ-অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। আর তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রের উক্তি সকল অগ্রাহ্য করিত। সংক্ষেপতঃ সমাজের ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এবংবিধ সমাজ-বিপ্লবের সময় এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। এ বিপ্লব দমন না করিলে সমাজ একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং শিথিল-বন্ধন হইয়া যাইত। ভারতের এবংবিধ অবস্থায় শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই

নিমিত্তই আনন্দগিরি তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আনন্দগিরি-লিখিত আচার্য্যের অবতার-প্রয়োজন এই;—নরাধম মনুষ্যদিগকে সদাচারভ্রষ্ট দেখিয়া নারদ ঋষি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে তাত! জগতের এই শোচনীয় অবস্থা কি আপনি দেখিতেছেন না, জগতের যাহাতে বিনাশ না হয় তাহার উপায়বিধান করুন।" ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া স্বগণসমভিব্যাহারে শিবলোকে প্রবেশ করিলেন এবং মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন "ভূলোকে ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে; লোকে বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়া মিথ্যাচার আশ্রয় করিতেছে; বিপ্রপ্রভৃতিরা বিচিত্র চিহ্ন দ্বারা দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে; দ্বিজবর্গ যথাকালে অগ্নিতে হোম করে না, পর্ব্বতিথিতে পিত্রাদির তৃপ্তির নিমিত্ত কব্য প্রদান করে না, সত্যলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদপাঠ করে না, এবং নানা-প্রকারে সর্ব্বসৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ কাপালিকাচারী, কেহ বা মদ্যমাংসাশী হইয়াছে। সকলেই সত্যশৌচাদি ধর্ম্ম্য কর্ম্ম জ্ঞান-রহিত পশুর ন্যায় কুপথে গমন করিতেছে এবং কুমত অবলম্বন করিতেছে। অতএব আপনি বেদমার্গ উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করুন।" ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এই প্রকারে সম্বোধিত শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বলোকে প্রতিপ্রয়াণ করুন, আমি জগতের রক্ষার নিমিত্ত এবং বেদমার্গ উদ্ধার করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইব।"

অনন্তর দক্ষিণাপথে চিদম্বরপুরে আকাশলিঙ্গ নামে এক

শিব আবির্ভূত হইলেন। সেই স্থানের মহেন্দ্র-বংশে উৎপন্ন সর্ব্বজ্ঞ নামে জনৈক দ্বিজ চিদম্বরেশ্বরের ভক্ত উপাসক হইলেন। সর্ব্বজ্ঞের সুলক্ষণবিশিষ্টা কামাক্ষী নামে এক পত্নী ছিলেন। চিদম্বরেশ্বরের প্রসাদে এই দ্বিজদম্পতী বিশিষ্টা নামে গুণবতী কন্যা লাভ করিলেন। আশ্চর্য্যকর্ম্মা শাস্ত্রশীল বিশ্বজিৎ নামে বিপ্র বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টা অত্যন্ত ভক্তিসহকারে শিবের আরাধনা করিতেন, কিন্তু তত্রাপি তাঁহার পতি বিশ্বজিৎ অরণ্যে তপস্যা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তদবধি সেই পতিব্রতা কামিনী একমনে চিদম্বর-মহেশ্বরের পূজন, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। একদা চিদম্বরেশ্বর স্বমন্দিরে সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে বিশিষ্টার বদন সরোজে জ্যোতিরাকারে প্রবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত-ঘটনাসন্দর্শনে সমবেত জনবর্গ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। শিবের উগ্রতেজঃপ্রবেশহেতু বিশিষ্টার গর্ভ অনুদিন উপচিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্বিজগণ তৃতীয়াদি মাসে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন। এই প্রকারে দশমাস অতীত হইলে পর যথাসময়ে বিশিষ্টার গর্ভহইতে শঙ্করাচার্য্য-রূপে মহাদেব অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জন্মক্ষণে স্বর্গ হইতে আনন্দ-সূচক পুষ্পবৃষ্টি পতিত এবং দেবদুন্দুভি-নিনাদ সমুত্থিত হইল।

শঙ্করার্য্যের আবির্ভাব যে আবশ্যক হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এত দিন হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নও থাকিত কি না

সন্দেহ স্থল। তিনি ভারতবর্ষের তাৎকালিক সমাজবিপ্লব নিবারণ করিয়া আর্য্যগণের প্রাচীন কীর্ত্তিসকল দৃঢ় করেন। যত কাল ভারতে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে ততকাল শঙ্করাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় রহিবে।

শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে নাম্বুরিব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন মতে কর্ণাটদেশান্তর্গত তুঙ্গভদ্রা নদী-তীর-স্থিত (৩) শৃঙ্গপুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তৃতীয় বর্ষে তাঁহার চৌড়কর্ম্ম, পঞ্চমে মৌঞ্জীবন্ধন এবং অষ্টমে উপনয়ন হইলে পর তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে, আচার্য্যের ললাটদেশ অর্দ্ধেন্দুশোভিত, বদন পূর্ণেন্দুশোভন, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, উরু এবং গুল্ফ স্থূল, পদ স্বল্প, নখ শোণবর্ণ, কর-পাদ-মধ্যস্থল শঙ্খচক্র প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত, মস্তকের বাম ভাগে ত্রিশূল-চিহ্ন এবং দক্ষিণ ভাগে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। চমৎকারিণী মেধাশক্তি, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রভাবে তিনি অল্পকালমধ্যেই অশেষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি বলেন, গুরুর সমীপে একবার শ্রবণ মাত্রেই আচার্য্য সর্ব্ববিদ্যাপ্রপঞ্চ অবগত হইয়াছিলেন। আনন্দ আচার্য্যকে কল্পবৃক্ষ কল্পনা করিয়া ষড়্দর্শনকে তাহার মূল, ইতিহাসকে স্কন্ধ, নিগমকে শাখা,

---

(৩) তুঙ্গ এবং ভদ্র নামে দুইটী নদীর সংযোগে জাত। ইহা 'দক্ষিণ,পথজাহ্নবী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা একটী তীর্থ-স্থান। বহুসংখ্যক যাত্রী ইহার জলে স্নান করিতে গমন করে।

বেদের ষড়ঙ্গকে পল্লব, শ্রৌতাদি সূত্রকে পুষ্প, বেদমন্ত্রকে শলাটু (অপক্ক ফল) এবং জ্ঞানকে পক্কফল—নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দ আরও লিখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের কল্পতরু, ভূদেবগণের কামপ্রদ, বেদে ব্রহ্মকল্প, ষড়ঙ্গে গার্গ্যসমান, বেদবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ-বিবেচনে বৃহস্পতিতুল্য, বৈদিককর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসায় জৈমিনিসম এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাসসদৃশ। আচার্য্য অনেক বিঘ্নে পতিত হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হন নাই। এইরূপে বিবিধশাস্ত্রের পারদৃশ্বা হইয়া তিনি বহুসংখ্যক শিষ্যদিগকে নিগমাদি শাস্ত্রসমূহের সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

এ স্থলে আমরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ—মাধবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তিনি শঙ্করবিজয় গ্রন্থকে প্রাচীন বলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ৫০০ বৎসরের লোক। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবদিগের চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীসম্প্রদায়ের সংস্থাপক রামানুজ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মত নিরাকরণপূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করেন। সুতরাং রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক। স্মৃতিকাল-তরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বকানান্ সাহেবকৃত মাইসোরগ্রন্থে (Buchanan's Mysore, vol. II. p-424) উল্লিখিত শিলালিপির প্রমাণে রামানুজ ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব রামানুজ যে একাদশ শত শকাব্দীর লোক

তাহা নিশ্চিত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ—তৈলঙ্গভাষা-রচিত কেরলোৎপত্তিনামক গ্রন্থের অনুসারে যৎকালে মলয়বর প্রদেশের রাজা শিওরাম, কৃষ্ণরাও নামক কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তৎকালে শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। এই ঘটনা কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য সহস্র বৎসরের লোক।

চতুর্থতঃ—শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিতে মলয়বর দেশের লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে তিনি সহস্রাধিকবৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে গুরু-পরম্পরা-শ্রুত মত এই যে তিনি দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সময়নিরূপণ করিতে প্রবাদ, কিংবদন্তী বা দেশের প্রচলিত মত বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চমতঃ—শঙ্করদিগ্‌বিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরদেশে গমন করিয়া সরস্বতী-পীঠে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি তত্রত্য স্বমতবিরোধীদিগকে পরাজিত করেন। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে যে, ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে গৌড়দেশ হইতে কতকগুলি পণ্ডিত কাশ্মীরস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের সহিত কাশ্মীরস্থ লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কারণবশতঃ ঘোর বিবাদ হইয়াছিল। আমরা এই জীবনীর শেষভাগে দেখিব যে শঙ্করাচার্য্য গৌড়দেশীয় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। সুতরাং রাজ

তরঙ্গিণীর পণ্ডিতেরা সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। গৌড়দেশ দ্বারা এস্থলে বঙ্গদেশ বুঝিতে হইবে না; সারস্বত, কান্যকুব্জ প্রভৃতিও পঞ্চ-গৌড় প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। অতএব ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে শঙ্করাচার্য্যই এই ঘোর বিবাদ ঘটাইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল। আচার্য্য তৎকালের লোক। এই কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সহজেই বিনিগমনা করা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্য ন্যূনাধিক খ্রীষ্টীয় ৭০০ হইতে ৮০০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে যখন সাক্ষাৎ কোন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন কেবল প্রতিফলিত আলোক এবং অন্যান্য কালনিরূপণোপায় দ্বারা যতদূর পারা যায়, ততদূর আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল স্থির করিতে চেষ্টা করা গেল। অষ্টম শতাব্দী অথবা সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ যে আচার্য্যের প্রাদুর্ভাবকাল তদ্বিষয়ে অনুকূল যুক্তি ভিন্ন প্রতিকূল কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেখা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য অল্পকালের মধ্যে নানাশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে, আচার্য্য সময়ে সময়ে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন। তৎসময়ে তাঁহাকে উদয়াচলে বালভানুর ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ড-গোল-কীলে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, জনক-নৃপতি-কৃত দ্বাদশবার্ষিক সত্রে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, পরীক্ষিৎ রাজার জ্ঞানবোধনকালে শুকদেবের ন্যায়, মেরুশিখরে তপশ্চর্য্যানিরত ব্যাসদেবের ন্যায়, রাম-কথাবর্ণনাকালে বাল্মীকির ন্যায়, ভাষ্যোপদেশ-সময়ে পতঞ্জলির

ন্যায়, দেবগণকে উপদেশদানকালে সুরাচার্য্যের ন্যায়, নারদ-ঋষিকে উপদেশদানকালে ব্রহ্মার ন্যায়, এবং যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্ব উপদেশ দিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্ন বোধ হইত। এইরূপে বহুশিষ্যকে উপদেশ দ্বারা ধন্য করিয়া অষ্টম বর্ষে তিনি শ্রীমৎগোবিন্দ যোগীন্দ্রের সদুপদেশানুসারে পরমহংসত্ব স্বীকার করিলেন। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এরূপ অসঙ্গত কার্য্য কেন করিলেন? ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় ক্রমশঃ স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বনী (বানপ্রস্থাশ্রমী) হইবে, এবং বনী হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি হইবে। আচার্য্য কেন ক্রমভঙ্গ করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের যে আশ্রমেই বিরাগ উৎপন্ন হইবে, সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যাশ্রম স্বীকার করিতে পারা যায়। কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, যে অবস্থাতেই বিরাগ হইবে সেই অবস্থাতেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—যে দিন সংসারে বিরাগ জন্মিবে সেই দিনেই পরমহংস হইতে পারিবে,—এই মত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ অবলম্বন করে নাই, তিনিই ইহা প্রথম প্রদর্শন করেন। অতএব আচার্য্য যে প্রব্রজ্যা স্বীকার করিলেন তাহা গর্হিত হয় নাই। অতি অল্প বয়সেই শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বীকার করিবার আত্যন্তিকী ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু মাতার অমত জন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। যখনই

মাতার নিকট ঐ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেন, তখনই মাতা স্নেহপূর্ণ কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য হইতে নিরস্ত করিতেন। কিন্তু মাতার অনেক অনুরোধেও বিবাহ করেন নাই। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মাতার একবার কোনক্রমে অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় এবং ধর্ম্মের চিন্তাতে জীবন ক্ষয় করিবেন। সর্ব্বদাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং কি সুযোগে মাতার অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারিবেন ইহাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল, সংসার বিষময় বোধ হইতে লাগিল, কি উপায়ে পরমহংস হইয়া সুখী হইবেন তাহাই অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিধি অনুকূল হইল এবং তাঁহার সুখের দিবস সুপ্রভাত হইল। তিনি তাঁহার মাতার সহিত স্বগৃহের নিকটে কোন আত্মীয়ের আলয়ে গমন করিলেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্বল্পতোয়া নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির জলে সে নদীটী পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা যখন প্রত্যাগমন করেন তখন দেখিলেন যে, নদী জলপূর্ণ, সহজে হাঁটিয়া পার হইবার উপায় নাই। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া জলের কিয়ৎ হ্রাস হইলে পর তাঁহারা নদীর গর্ভে নামিলেন এবং পরপারে যাইবার নিমিত্ত ক্রমশঃ পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারাও ক্রমশঃ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন আর পূর্ব্বপারে ফিরিয়া আসিবার উপায় রহিল না।

তাঁহাদের জলমগ্ন হইয়া মরিবার উপক্রম ঘটিল। তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির বলে মাতাকে বলিলেন, জননি! যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণে অনুজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি করুণাময় ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, নতুবা উভয়কেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার মাতা ভয়ে ভীতা এবং বিষম বিপদে বিহ্বলা হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণে পুত্রকে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য দ্বিগুণবলের সহিত মাতাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া নদীসন্তরণপূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ঈশ্বরের জয় প্রচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাসময়ে ভক্তির সহিত মাতার চরণারবিন্দে প্রণাম এবং যথারীতি প্রদক্ষিণাদি করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রয়াণ করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য আর্য্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নখদর্পণ ছিল। এই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি অদ্বৈত মত প্রচার করিতে বাসনা করিলেন। সত্যজ্ঞানানন্দময় এক মাত্র ঈশ্বরই সত্য, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময়; ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ। যদ্রূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিকাতে রজতভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চমাত্র জগৎকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কোন প্রভেদ নাই। সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণলক্ষিত পরমাত্মার সম্যক্ সাক্ষাৎকারলাভ হইলে এই ভেদভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া জীবাত্মার মুক্তি হইবে। শঙ্করাচার্য্যের

অদ্বৈতমত এই জীবনীর উপসংহারকালে বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের এবংবিধ উপদেশপ্রভাবে বহুসংখ্যক শিষ্য শুদ্ধাদ্বৈতমতপরায়ণ এবং সদাচারতৎপর হইল। তিনি সকলকেই কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইতে এবং কর্ম্মসমুদায় ব্রহ্মে অর্পণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কহিতেন, নিত্য কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করেন এবং নর মুক্ত হয়। আত্মার ইহলোকে এবং পরলোকে একরূপতাবশতঃ, প্রাণীর কর্ম্মক্ষয় হইলেই দেহত্যাগ হয়, এবং এই দেহত্যাগই মুক্তি। যে দেশের লোক অদ্বৈতমতাবলম্বী সেই দেশ পুণ্যবর্দ্ধন। যাহারা অদ্বৈতদর্শন পর তাহারাই মুক্ত। মূঢ় এবং দুঃখভোগী যাহারা অদ্বৈত মতের নিন্দা করে, তাহারা মাতৃনিন্দানিরত পামরদিগের ন্যায় নিরয়গামী হইয়া থাকে। ক্রমশঃ পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, আনন্দগিরি প্রভৃতি অনেক শিষ্য তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আচার্য্য দ্বৈতবাদীদিগকে জয় করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য স্বশিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে চিদম্বরস্থল হইতে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়া মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীমধ্যার্জ্জুনেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তত্রত্য লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশগ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধাদ্বৈতমত অবলম্বন করিল। ক্রমে

ক্রমে তদ্দেশস্থিত সকল ব্রাহ্মণকে অদ্বৈতমত গ্রহণ করাইয়া শিষ্যসমেত তিনি সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিলেন। এখানে দেশীয় প্রবাদানুসারে পঞ্চসহস্রাধিকবৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরাভিধেয় এক শিবমূর্ত্তি আছেন। শঙ্করাচার্য্য বিবিধবিধানে রামেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া সেই স্থানে মাসদ্বয়-পরিমিতকাল অবস্থিতি করিলেন। তখন অদ্বৈতমতপরিপন্থী শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভট্ট, জঙ্গম ও পাশুপত নামে পরিচিত ষড়্বিধ সম্প্রদায় শিবচিহ্নধারণপূর্ব্বক তাঁহার সকাশে আগমন করিয়া তাঁহাকে নানাজাতীয় প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাদের প্রশ্নাবসানে তিনি ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বমত উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে লিঙ্গচিহ্নধারীদিগের নেতা বিদ্বেষবীর বারংবার আচার্য্যের পাদবন্দনা করত তদুক্ত আচার এবং উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্ববংশীয়, স্বদলীয়, ও স্বদেশীয় সকলকে অদ্বৈতমতগ্রাহী করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। এবম্প্রকারে তদ্দেশ হইতে শিবমত নিরস্ত হইলে পর, পীঠার্চ্চনতৎপর, শুভ্রবিভূতি বিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, রুদ্রাক্ষমালা-পরি-শোভিতকণ্ঠশিরস্ক প্রতিপক্ষ চণ্ডভৈরব প্রভৃতি শৈবমতাবলম্বি-গণ আচার্য্যের সমীপে আগত হইল এবং স্বস্বমতসমর্থনার্থে নানাশাস্ত্র হইতে বহুবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া শিবের সর্ব্বোত্তমতা, সর্ব্বাত্মকতা, সর্ব্বকলুষনাশকতা প্রভৃতি প্রমাণিত করিতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ রুদ্রের উপাসনা দ্বারাই মোক্ষ-সিদ্ধি হয় সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের লিঙ্গবিভূতিপ্রভৃতি চিহ্নধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য সপ্রমাণ করিল। শঙ্করাচার্য্য তাহা-

দিগের মতনিরসন করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে, "তোমরা এক্ষণে পামরবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক লিঙ্গাদি চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া বেদাদিষ্টকর্ম্মনিবহ ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যানুসন্ধান করত জন্ম-মরণ-প্রবাহের উৎসস্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া লিঙ্গদেহভঙ্গদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা পরমগুরু শঙ্করকে অভিবাদনপুরঃসর সপরিবারে ও সবান্ধবে লিঙ্গধারণরীতি পরিহারপূর্ব্বক সম্যক্ উপদিষ্ট শুদ্ধাদ্বৈতমত স্বীকার করিল। এইপ্রকারে আচার্য্যের শৈবমতনিবর্হণ সমাপ্ত হইল। তদনন্তর তিনি অনন্তশয়নাখ্য স্থানে যাত্রা করিলেন। অনন্তশয়নে অনন্তনামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিলেন। সশিষ্যগণের সহিত তথায় এক মাস কাল বাস করিলেন। তথায় ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস এবং কর্ম্মহীন এই ষড়্‌বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল। ইহারা জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে আবার দ্বাদশবিধ। অনন্তদেবের চরণ-দর্শন ও সেবাকে ইহারা কর্ম্ম বলিত এবং তাঁহার আশ্রয়ে স্থিরভাবে অবস্থানকে জ্ঞান বলিত। অনন্তদেবের পাদপদ্ম ইহাদের একমাত্র শরণ ও আশ্রয়। আচার্য্যকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ইহারা নিজ নিজ মত ব্যাখ্যা করিলে পর, তিনি ইহাদের মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন "তোমরা ব্রাত্য ও ধর্ম্মের বহিষ্কৃত; অতএব আমাদিগকে তোমাদের সংসর্গে দূষিত করিও না, এ স্থান হইতে দূর হও।" আচার্য্যের এই তিরস্কার নিশমন করিয়া তাহারা করুণস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল "যতিনাথ! আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন" এবং দণ্ডবৎ প্রণাম-

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। তাহাদিগকে শরণাগত দেখিয়া তিনি হস্তামলক-প্রমুখ শিষ্যদিগের হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনান্তে তিনি তাহাদিগকে সদুপদেশদানপূর্ব্বক অদ্বৈত-মতাবলম্বী করিলেন। এইরূপে বৈষ্ণবসম্প্রদায়সমূহের মত-খণ্ডন করিয়া এবং তাহাদিগকে স্বমতে আনিয়া তিনি অনন্ত-শয়ন হইতে পশ্চিমাশামুখে প্রস্থান করিলেন। এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া স্বশিষ্যগণ সহিত সুব্রহ্মণ্য দেশে উপনীত হইলেন।

সুব্রহ্মণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য তত্রত্য কুমার-ধারানদীতটে বাসস্থান নিবেশিত করিলেন। কুমারধারা দক্ষিণাবর্ত্তে মৈসুরপ্রদেশস্থিত সাগরবাহিনী নদীবিশেষ। সুব্রহ্মণ্যে কুমারদেবের এক মন্দির ছিল। এ স্থলে হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি এবং সূর্য্যের উপাসকদিগের সহিত তাঁহার আত্যন্তিক বিচার হয় এবং তাহারা বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক অদ্বৈতমত আশ্রয় করে। তদনন্তর ত্রিসহস্র-শিষ্যপরিবৃত হইয়া তিনি বায়ুকোণে চলিলেন। তদীয় শিষ্যগণ শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আঘ্রাত করিয়া চামরপিচ্ছাদি দ্বারা আচার্য্যকে ব্যজন করিতে করিতে ক্রমাগত বায়ুকোণে অগ্রসর হইতে লাগিল। মার্গস্থিতদেশবাসিবিপ্রগণ অদ্বৈতমত গ্রহণ করিল। অবশেষে তিনি গণবরপুরে আগমন করিলেন এবং কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া তত্তীরে প্রতিষ্ঠিত গণপতিদেবের মন্দিরে একমাস

বিশ্রাম করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পদ্মপাদপ্রভৃতি ত্রয়োদশজন শিষ্য দিগ্‌গজ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এবং সকলে মিলিয়া মহাসমারোহে তাঁহার স্তুতি করিলেন। তথায় তিনি গাণপত্যদিগকে অদ্বৈতমত গ্রহণ করাইয়া ভবানীনগরে প্রয়াণ করিলেন। এই স্থানে এক মাস অবস্থিতি পূর্ব্বক ভবানীভক্ত, কমলাভক্ত, শারদাভক্ত এবং বামাচারপরায়ণ শাক্তদিগকে স্বমতচ্যুত করিয়া অদ্বৈতমতে আস্থাবান্ করিলেন। অনন্তর তিনি উত্তর দিকে প্রস্থান করিয়া উজ্জয়িনীনগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন উজ্জয়িনী কাপালিকদিগের কেন্দ্রভূমি। উজ্জয়িনীনগরে দুই মাস বাস করিয়া তিনি কাপালিক, চার্ব্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিলেন। এই বৌদ্ধমত শাক্যসিংহপ্রচারিত মত হইতে বিভিন্নপ্রকার। শবরনামক বৌদ্ধ তাঁহাকে বলিল "অদ্বৈতমত শশবিষাণবৎ অসম্ভব, সুতরাং অগ্রাহ্য। মনুষ্য আজীবন নানারূপে অন্নপানাদি দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ ও পরিতৃপ্ত করিবে এবং মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করিবে। পরকাল লইয়া মস্তিষ্কবিলোড়ন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা দেখিতেছ তদনুসারে কার্য্য কর। সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন কর এবং আনন্দানুভব দ্বারা জীবন সফল কর। দেহপাত হইলেই মোক্ষাবাপ্তি হইবে।" আচার্য্য তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন দেহধ্বংস হইলে মুক্তি হইতে পারে না, কারণ পরলোকগমন শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির আর কোন উপায় নাই। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতদর্শন দ্বারাই পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ

করিয়া অদ্বৈতমতগ্রহণ দ্বারা সুস্থ হও।” কাপালিকদিগের মতে কর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না; সুতরাং তাহারা কর্ম্মহীন। তাহারা মদ্যপায়ী, স্ত্রীজাতির মর্য্যাদাহন্তা এবং বেদাদিশাস্ত্রের অবজ্ঞাতা। তাহারা সংহারভৈরবের উপাসক। তাহারা কদর্য্যাচারপরায়ণ এবং দুষ্টযুক্তিশীল। উন্মত্তভৈরবাভিধান জনৈক শূদ্রজাতীয় কাপালিক শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচার-প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন “রে বর্ব্বর! দূরীভব, তোরে আমার কি প্রয়োজন? দুষ্টব্রাহ্মণদমন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি দুষ্টমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ডবিধানপূর্ব্বক সৎপথে আনয়ন করিতে আসিয়াছি। অপর জাতিরা ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিবে।” চার্ব্বাকমতা-বলম্বী বিচারে বিজিত হইয়া আচার্য্যের পুস্তকাদিবাহক হইয়াছিল। চার্ব্বাক এই ভাবে নিজমত ব্যাখ্যা করিয়াছিল—“শরীরের নাশই মোক্ষ, মৃত্যুই মুক্তি; ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন হইতে পারে না; স্বর্গ ও নরক পার্থিব সুখ ও দুঃখ ভিন্ন কিছুই নহে; মৃতব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল; অতএব জীবিতকালে কেবল আনন্দেই রত থাকিবে।” জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিল “জিনদেব সকলের মুক্তিদাতা এবং সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন—ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা দেহনাশের পরেই মুক্তি হয়। জীব শুদ্ধ, দেহ কেবল মলপিণ্ড, জীবের সৎকর্ম্মের প্রয়োজন নাই।” তদনন্তর আচার্য্য উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া বায়ুকোণে যাত্রা করিলেন এবং কিছুকাল ব্রহ্মানন্তর অনুমল্লনগরে মল্লারিদেবের উপাসক-দিগকে, মরুদ্ধপুরে বিষ্বক্‌সেন ও কামদেবের উপাসকদিগকে,

মাগধপুরে কুবেরভক্তগণকে, ইন্দ্রপ্রস্থনগরে ইন্দ্রভক্তদিগকে, যমপ্রস্থপুরে যমোপাসকদিগকে এবং প্রয়াগনগরে বরুণ বায়ু প্রভৃতির উপাসকবর্গকে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতমতে আনয়ন করিলেন। প্রয়াগনগরে সাংখ্য এবং যোগমতাবলম্বীরা তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমতগ্রহণ করিয়াছিল। তথা হইতে তিনি কাশীতে উপনীত হইলেন এবং কম্মমত, চন্দ্রমত, গ্রহমত, গরুড়মত, সিদ্ধমত, গন্ধর্ব্বমত, ভূতবেতালমত প্রভৃতির (৪) নিরাস করিবা বিপথগামী নানাদুষ্টমতানুযায়ী ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সকলকে পদদলাক্রান্ত করিলেন। এইরূপে অদ্বৈতমতের উপাসকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তিনি বারাণসী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই বারাণসীতে (৫) তাঁহার ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ ও বিচার হয়।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্করাচার্য্য স্নানানন্তর নিদিধ্যাসন করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ ব্যাস একটী স্থবির ব্রাহ্মণের ন্যায় আগমন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের ষট্‌সহস্র শিষ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে?

---

(৪) যাঁহারা এই সকল মতের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৮০১ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দশমকল্পে প্রথমভাগের ৪৩০, ৪৩৩ এবং ৪৩৪ সংখ্যাতে তাহা পাইবেন। সাধারণপাঠকের বিরক্তিকর হইবে বলিয়া এই সকল মতের বিশেষ বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

(৫) বারাণসীনাম একণে বাণারসীনামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাশ্যারসী অনুসারে ইংরাজী বেনারস (Benares)। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের অধস্তন সংস্কৃতগ্রন্থে বাণারসীনাম দৃষ্ট হয়। শক্রঞ্জয়মাহাত্ম্য এবং বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বারাণসী পাঠের পরিবর্ত্তে বাণারসী পাঠ আছে। ইহা লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া বোধ হয় না।

শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিল, ইনি পরম গুরু শঙ্কর, ইনি সেতুবন্ধ প্রভৃতি প্রদেশস্থ কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিয়া দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এক্ষণে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বিনির্ণয় করিয়াছেন এবং অদ্বৈতমতাবলম্বী। তখন ব্যাস শঙ্করের নিকট উপসর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা করিয়াছ? বল দেখি, কোন্ স্থলে তোমার ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি কোন্ স্থল বুঝিতে পার নাই তাহা বল, আমি অর্থ করিয়া দিতেছি। বৃদ্ধ বলিল "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং" এই ৩।১।১ সূত্রের তুমি কি অর্থ করিয়াছ? শঙ্কর একরূপ অর্থ করিলেন, বৃদ্ধ আর একরূপ অর্থ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য জানিতেন না যে ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধ ব্যাস। উভয়েই বাদানুবাদ করিতে করিতে উষ্ণ হইতে লাগিলেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকে বলিলেন 'তুমি ইহার তত্ত্ব কিছুই বুঝ না" এবং এই বলিয়া তাঁহার কপোলদেশে এক চপেটাঘাত করিলেন। কপোলতাড়ন করিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন, এই বৃদ্ধকে দূর করিয়া দেও। বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণমাত্র আপনি শীঘ্র দূরে চলিয়া গেলেন। পদ্মপাদ তখন গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, প্রভো!

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বতঃ।
তয়োর্ব্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিঙ্করঃ কিং করোম্যহম্॥"

আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর, ব্যাস নারায়ণ, আপনাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে, আমি কিঙ্কর কি করিব। তখন

শঙ্করাচার্য্য অনেক আরাধনা করিয়া ব্যাসকে প্রত্যাবৃত্ত করিলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্যাস প্রসন্ন হইয়া অদ্বৈতবাদের সর্ব্বত্র জয় হইবে এবং তোমার শত বর্ষ পরমায়ুলাভ হইবে বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে এই ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নহেন। কাশীতে প্রথম ব্যাসের সময়াবধি বরাবর এক এক জন ব্যাস আছেন। ব্যাস উপাধিমাত্র। এক্ষণেও কাশীতে হরেকৃষ্ণ বেদব্যাসনামে এক জন ব্যাস অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়নই শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শঙ্করবিজয়ে এমন কোন বাক্য দৃষ্ট হয় না যে ব্যাসকে দ্বৈপায়ন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আনন্দগিরি কিন্তু যে কি বুঝিয়াছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার লিখিত বিজয়ে তিনি কিছুই স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। তাঁহার এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে ব্যাস চিরকাল বর্ত্তমান এবং সেই ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা ব্যাসই আসিয়াছিলেন। আমরা তাহা বলিতে পারি না, যেহেতু তাহাতে সময়গত দোষ উপস্থিত হয়। ব্যাস চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন আর শঙ্কর এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে উপস্থিত হন। সুতরাং ইনি তাৎকালিক ব্যাস বলিয়া মীমাংসা সমীচীন বোধ হয়।

কাশী হইতে উদীচীমুখে প্রস্থান করিয়া শঙ্কর অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ নামে শিবমূর্ত্তিদ্বয়দর্শনপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং কুরুক্ষেত্রসন্দর্শনানন্তর বদরিকাশ্রমে সমুপস্থিত

হইয়া তত্রত্য বদরীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সে স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া আচার্য্য স্নিগ্ধ হইলেন এবং দ্বারকাদি দিব্যস্থল ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন। অযোধ্যা হইতে গয়া, গয়া হইতে গঙ্গা, গঙ্গা হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই প্রদেশে আচার্য্য এক মাস বাস করিলেন। ইতিমধ্যে রুদ্ধাখ্যপুর হইতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকটে সমাগত হইয়া নিবেদন কবিল যে, ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত উত্তরদেশ হইতে আসিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের শিবশ্ছেদন করিয়াছেন এবং উহাদিগের মস্তক উদুখলে চূর্ণ করিয়াছেন। অবশেষে তিনি কোন জৈন গুরুব নিকটে পবাজিত হইয়া কিছু উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্বেদাপন্ন হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া শঙ্কর সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রুদ্ধাখ্যপুরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে ভট্টাচার্য্য "আমি জৈন বধ কবিয়া কি সর্ব্বনাশ কবিয়াছি, যখন জৈনেব নিকটে শিক্ষালাভ করিলাম, তখন জৈন আমার গুরু হইল, সুতরাং গুরুবধ করিয়াছি" এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নি দ্বারা দেহপাত করিতে সংকল্প কবিয়াছেন। তখন তাঁহার দর্শনার্থ শীঘ্র গমনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ভট্টাচার্য্যের জানুপর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ভট্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে দ্বিজ! তুমি অজ্ঞানতঃ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি গূঢ় বেদার্থ পরিজ্ঞাত নহ।" ইহা শুনিয়া ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি নূতনতর বৌদ্ধ?" শঙ্কর উত্তর করিলেন "আমি বৌদ্ধ

ছি, অদ্বৈত-মত-প্রচারক শঙ্করাচার্য্য।" তখন ভট্ট বলিলেন "যদি তোমার এতই বাদকণ্ডূয়া (চুলকানি) হইয়া থাকে, তবে আমার ভগিনীপতি মণ্ডনমিশ্রের নিকট গমন কর এবং তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়া কণ্ডূয়া-নিবৃত্তি কর। আমি এই অবস্থায় পরলোকে চলিলাম," এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য নিমীলিতাক্ষ হইলেন এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভট্ট একজন কর্ম্মকাণ্ডাবলম্বী ছিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্য রুদ্ধাখ্যপুরস্থ সমুদয় লোকদিগকে অদ্বৈত মত গ্রহণ করাইয়া তথা হইতে মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে উত্তরদিকে প্রয়াণ করিলেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ ঢকা, শঙ্খ, করতাল প্রভৃতি বাদ্য দ্বারা এবং আচার্য্যের জয়শব্দ দ্বারা দিক্‌হস্তীদিগের কর্ণকুহর বধির করিয়া চলিলেন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য উত্তর দিক অবলম্বন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরের আগ্নেয় কোণে বিজিলবিন্দু নামে প্রথিত বিদ্যালয়স্থলের সন্নিহিত এক তালবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই তালবনে মণ্ডনমিশ্রের নিবাস। ইনি একজন সুদক্ষ কর্ম্মকাণ্ডাবলম্বী এবং জ্ঞানকাণ্ডবাদীদিগের ঘোর বিপক্ষ। ইনি পঞ্চশত শিষ্যদিগকে দিগ্বিজয়ে সমর্থ করিয়াছিলেন। মণ্ডনমিশ্রের আলয়ে দাস দাসী ও শুক সারিকা পর্য্যন্ত সকলে সংস্কৃত শ্লোক বলিতে পারিত।

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কবাট রুদ্ধ রহিয়াছে এবং শুনিলেন যে মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধ করিতেছেন। প্রাণায়ামবলে শূন্য মার্গ দিয়া আচার্য্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া মণ্ডনমিশ্রের সন্নিহিত হই-

লেন। সন্ন্যাসিদর্শনে মণ্ডনমিশ্র কোপাকুলিতচিত্ত হইয়া বলিলেন, আঃ! এ মুণ্ডী আবার কোথা হইতে আসিল? ক্ষণকাল উভয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর হইল। অবশেষে ব্যাসের বাক্যানুসারে মণ্ডনমিশ্র আচার্য্যকে পাদ্য প্রদান করিলেন। মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধে ব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; আনন্দগিরি বলেন যে মিশ্র মন্ত্র-শক্তিবলে ব্যাসকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। পাদ্য-গ্রহণ-কালে আচার্য্য বলিলেন "বিচা-রের নিমিত্ত আসিয়াছি।" মিশ্র উত্তর করিলেন "ভোজনান্তে বিচার করিব।" বাদের (বিচারের) পণ হইল যে, যিনি পরা-জিত হইবেন তিনি স্বমত ত্যাগপূর্ব্বক বিজেতার মত অব-লম্বন করিবেন। মিশ্রপত্নী সরসবাণী উভয়পক্ষ-গ্রহণ-সমর্থ মধ্যস্থ রহিবেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সরসবাণী ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। নিগমাদি সর্ব্ববিদ্যা-প্রসঙ্গে শত দিন বিচার হইল। শত দিনের পরে সরসবাণী মণ্ডনমিশ্রকে বলিলেন "নাথ! আসুন, ভিক্ষার্থ গমন করি"। মণ্ডনমিশ্র বিচারে পরাস্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের চরণে প্রণতি-পুরঃসর তদুপদেশানুসারে সন্ন্যাসী হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। সরসবাণী দেখিলেন যে পতি সন্ন্যাসা-শ্রম স্বীকার করিয়া যতি হইলেন এবং তাঁহাকে পতির জীবিতাবস্থাতেই বিধবা হইতে হইল। এই দুঃখে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন "সরসবাণি, তুমি ব্রহ্মশক্তি এবং মণ্ডন মিশ্রের পত্নী। আমার সহিত বিচার না করিয়া তুমি যাইতে পারিবে না। অতএব আমার নিকটে পরাভব

স্বীকার কর।” সরসবাণী বিচার আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমে কামশাস্ত্রে নায়িকানায়কপ্রপঞ্চের আলাপ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য কামশাস্ত্র পাঠ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন আচার্য্য বলিলেন “মাতঃ! আপনি ছয় মাস কাল অপেক্ষা করুন, আমি কামকলা শিক্ষা করিয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া তিনি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন এবং পশ্চিম দিকে গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে এক রাজার মৃত দেহ চিতার উপর নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই পুরের প্রান্তভাগে স্থিত এক গিরিগহ্বরে নিজদেহসংস্থাপনপূর্ব্বক স্বশিষ্যদিগকে তাহার রক্ষণে নিয়োজিত করিয়া পর-শরীর-প্রবেশ-বিদ্যা-প্রভাবে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাজপুরে রাজ্ঞীর নিকটে কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। রাজ্ঞী অতিশয় চতুরা, রাজার আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল এবং তিনি ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন “দ্বাদশ যোজনের মধ্যে নদী, গিরিগুহা, দেবালয় প্রভৃতি যে কোন নিভৃত স্থানে কোন মৃত দেহ দেখিতে পাইবে, তাহা আনিয়া দাহ কর।” ভৃত্যগণ অনেক অন্বেষণ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মৃত দেহ প্রাপ্ত হইল এবং তাহা দাহ করিতে লইয়া চলিল। তাঁহার শিষ্যগণ রাজার সকাশে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্বোধন করিতে লাগিল। তখন শিষ্যকর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রাজদেহ বিসর্জন করিয়া স্বদেহান্বেষণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য সূক্ষ্ম শরীরে স্থূল শরীর অন্বেষণ

করিয়া চিতার উপর উহা প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলেন এবং কপালমধ্য দিয়া দেহে প্রবেশপূর্ব্বক চিতা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি দ্বারা তাঁহারে আরোগ্য সাধন করিয়া "সর্ব্বলোক জয় কর" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিরোধান করিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্য সত্বর মণ্ডনমিশ্রভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সরসবাণীর নিকটে উপনীত হইলেন এবং বিচারপ্রার্থনা করিলেন। সরসবাণী অশ্লীল আলাপ হইবার শঙ্কাবশতঃ নিজের পরাভব স্বীকার করিলেন। এই প্রকারে সরসবাণীকে জয় করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে মন্ত্রবদ্ধ করিলেন এবং তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতীকে কহিলেন "তুমি আমার মঠে চিরকাল স্থির হইয়া অবস্থিতি কর।" এই মঠ অদ্যাপি শৃঙ্গগিরি বা সিংহারি নামে প্রথিত। অনন্তর তথায় বিদ্যাপীঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতীসম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। অত্রত্য শিষ্যমণ্ডলীর ভারতী নাম প্রদান করিলেন। ভারতীসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়; ইহাদের মধ্যে মূর্খ সন্ন্যাসী ছিল না। সন্ন্যাসী তিন প্রকার—ভারতী, গিরি ও পুরী। অনেকে বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য ভারতীসম্প্রদায়, গিরিসম্প্রদায়, পুরীসম্প্রদায়, এই তিন সম্প্রদায়ই সংস্থাপিত করেন। কিন্তু আনন্দগিরির বিজয়ে ভারতীসম্প্রদায়ের মাত্র উল্লেখ আছে। আনন্দগিরি গিরিসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ভারতী ও গিরিসম্প্রদায়ের মহান্ত সকল ভারতবর্ষের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। ভার-

কেশ্বরের মহান্ত গিরিসম্প্রদায়ের লোক, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই তিন জন ভারতীও আছে। পুরী-সম্প্রদায় আমরা অবগত নহি।

শৃঙ্গগিরি মঠে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করিয়া এবং নিজ অন্তেবাসী সুরেশ্বরাচার্য্যকে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ করিয়া শঙ্করাচার্য্য তথা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি অহোবল-নামক স্থানে নৃসিংহদেবোপাসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া বৈকল্যগিরিতে উপস্থিত হইলেন, এবং সে স্থান হইতে কাঞ্চীনগরে প্রবেশপূর্ব্বক অদ্বৈতমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎপরে কাঞ্চীনগর হইতে বহির্গত হইয়া বিদ্যাকামাক্ষীনাম্নী ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠাকরণানন্তর শ্রীচক্র-রচনা করিলেন। শ্রীচক্র বৈদান্তিকদিগের উপাস্য, যেহেতু ইহার উপাসনা দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হয়। শ্রীচক্রনির্ম্মাণান্তে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত হিমাচল হইতে সেতুবন্ধ-পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে লোকসাধারণ অদ্বৈতমত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। পুনর্ব্বার পৌত্তলিকতার আবি-র্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। আচার্য্য শঙ্কিত হইলেন এবং কিরূপে অসৎমতের প্রতিরোধ করিতে পারিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজ শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি তাহাদিগকে অদ্বৈতমতের অবিরোধে শৈব মত, বৈষ্ণব মত, সৌর মত, শক্তি মত, গাণপত্য মত প্রভৃতি সংস্থাপন ও প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। এই

সকল মত অদ্যাপি অদ্বৈত মতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলিতেছে। এক্ষণে আর শুদ্ধ কোন মত দৃষ্ট হয় না। সকলেই অদ্বৈত মত অব্যাহত রাখিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। নব্য স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অদ্বৈত মতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুচিত্তকে এরূপ অদ্বৈত-মত-প্রবণ করিয়া গিয়াছেন, যে অদ্যাপি হিন্দুগণ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণাবর্ত্তে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব বিস্তর; তথায় তিনি দেবতা, তাঁহার মত অভ্রান্ত। বঙ্গদেশে বৈদান্তিক মতের প্রচার অতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব ও আদর অতি অল্প। যে স্থানেই বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন ও চর্চ্চা আছে, সে স্থানেই শঙ্করাচার্য্যের একাধিপত্য। কি আধুনিক সাংখ্য শাস্ত্র, কি আধুনিক মীমাংসা, কি আধুনিক পুরাণ সর্ব্বত্রই অদ্বৈত মতের মিশ্রণ এবং সংসৃষ্টি। কেবল বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রই অদ্বৈত মতের সহিত সম্বন্ধ রাখে না।

এইরূপে অদ্বৈত মত-মিশ্রিত অন্যান্য মত প্রচারিত হইলে পর শঙ্করাচার্য্যের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল, এবং তিনি স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরে অন্তর্হিত করিয়া সদ্রূপ হইলেন। তদনন্তর সূক্ষ্মশরীর কারণশরীরে বিলীন করিয়া চৈতন্যরূপ হইলেন। তাঁহার অলীক ও ক্ষণিক দেহত্যাগের পর শিষ্যগণ মহাসমারোহের সহিত অত্যন্ত শুচি প্রদেশে গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তাঁহার সমাধি করিলেন। কাঞ্চী নগরেই শঙ্করাচার্য্য এই ভৌতিক জগৎ ত্যাগ করেন। কোন কোন মতে তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর।

আনন্দগিরিও বোধ হয় ইহাই বিশ্বাস করেন, কারণ বিজয়ানুসারে অষ্টম বর্ষে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং ৫।৬ বৎসর পরে বিদ্যাপীঠে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করেন। অতঃপর স্বমতপ্রচারে ও নগরচক্রাদিনির্ম্মাণে ৫।৬ বৎসর অতীত হয়। ৫৩ প্রকরণে শঙ্করাচার্য্য ব্যাস ঋষিকে বলিয়াছেন যে "আমি আর ষোড়শ-বর্ষ-মাত্র বাঁচিব, তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত অদ্বৈত মতের প্রচার সম্ভাবনা দেখি না। তদনুসারে ব্যাস ব্রহ্মাকে শঙ্করের আয়ুর্বৃদ্ধ্যর্থ অনুনয় করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন, শঙ্কর যতদিন পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ততদিন থাকিতে পারিবেন। কিন্তু ব্যাস তাঁহাকে "তুমি শতায়ুঃ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যদিও শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার কার্য্যকলাপ অসম্ভব হইতে পারে না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সুতরাং অল্প কাল মধ্যে অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও কার্য্যসমূহ অলৌকিক।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত একপ্রকার বর্ণিত হইল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলী হইতে আমরা যতদূর পারিয়াছি সঙ্কলন করিয়াছি, কিন্তু শঙ্করবিজয়ই প্রধান অবলম্বন। শঙ্করদিগ্বিজয়ের সহিত ইহার অনেক স্থল সংলগ্ন হইবে না, কারণ মাধবাচার্য্য কবি এবং শঙ্করের বহুকালপরবর্ত্তী। মাধব অবতারবৃত্তান্ত যেরূপ রঞ্জিত করিয়াছেন তাহা

কাব্যের যোগ্য। শিব অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া কার্ত্তিক কুমারিল স্বামী, ইন্দ্র সুধন্বানামে নৃপতি, বিষ্ণু সঙ্কর্ষণ, অনন্ত নাগ পতঞ্জলি এবং ব্রহ্মা মণ্ডনমিশ্র ও সরস্বতী সরসবাণী রূপে অবতীর্ণ হইলেন। কেরলাখ্যপ্রদেশে পূর্ণানদীতীরে বৃষাদ্রিনামক স্থলে বিদ্যানিবাস বলিয়া একজন অশেষশাস্ত্রকুশল পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যানিবাসের শিবগুরু নামে এক পুত্র জন্মে। শিবগুরু নানাবিদ্যাপারদর্শী হইলেন, এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত জীবন যাপন করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু স্বকীয় পিতা ও মাতার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত অবশেষে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কন্যা ও কন্যাযাত্রীরা বরের বাটীতে আগমন করিল এবং নির্ব্বিঘ্নে উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এইরূপ নূতনপ্রকার বিবাহ অধুনা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য এই বিবাহের ফল। শিবগুরু অনেক যত্নেও সন্ন্যাসী হইতে পারিলেন না, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সহজেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, মাধবাচার্য্য অন্ততঃ ৬৫০ বৎসর পরকালীন। সুতরাং মাধবাচার্য্য অপেক্ষা আনন্দগিরির কথা আমাদিগের অধিক শ্রদ্ধেয়। আমরা, "দিগ্বিজয়" ও সদানন্দকৃত "দিগ্বিজয়সার" এই গ্রন্থদ্বয়ের সহিত "শঙ্করবিজয়ের" কতিপয় বৃত্তান্ত-বৈষম্য প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-সম্বন্ধে মতভেদ। কি জন্মভূমি, কি পিতা মাতার নাম, কি অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত, কিছুরই মিল নাই। শঙ্করবিজয়ের কথা আমরা

পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় মতে দেবগণ মহাদেবের নিকটে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত সমাজের পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া দেবগণকে তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। কার্ত্তিকেয় (৪) কুমারিলভট্টরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জৈমিনি-সূত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্রদেব সুধন্বা নামে মগধরাজ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বরূপনামক বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীর সহিত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ হইলেন এবং অনেক বিপক্ষ পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া মণ্ডনমিশ্র নামে বিখ্যাত হইলেন। চন্দ্র পদ্মপাদ, পবন হস্তামলক, বৃহস্পতি আনন্দগিরি, বরুণ চিৎসুখ হইলেন। ব্রহ্মপত্নী সরস্বতীও ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া যথাকালে বিশ্বরূপের সহিত পরিণীত হইলেন।

কার্ত্তিকেয় জন্মপরিগ্রহ করিয়া নানা শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং কর্ম্মমত সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সুধন্বা নৃপতির সভাতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিচার হইল এবং অবশেষে বৌদ্ধগণ পরাভূত হইলেন। এই বিচারে পরাস্ত হইয়াও বৌদ্ধগণ পরাজয় স্বীকার না করাতে নৃপতি জয় ও পরাজয় নির্ণয় করিবার দুইটী উপায়

(৪) ইনি তন্ত্রবার্ত্তিকের রচয়িতা এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টমশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

স্থির করিলেন। বৌদ্ধগণ তাহাতে সম্মত হইল। যে পক্ষ পরাজিত হইবে তাহারা নিহত হইবে। প্রথমতঃ যিনি উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত হইয়া অক্ষতশরীর থাকিবেন তাঁহার মত সত্য ও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, কুমারিলভট্ট বেদ স্মরণ-পূর্ব্বক গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে পতিত হইলেন এবং অণুমাত্র আঘাত না পাইয়া ধরাতলে আগত হইলেন। নরপতি বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া খল-সংসর্গ দূষিত আপনাকে বারংবার নিন্দা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শঠ বৌদ্ধগণ বলিল, মহা-রাজ! মন্ত্র মহৌষধি প্রভৃতি দ্বারা দেহ রক্ষা অসম্ভব নহে, তাহাতে বেদশাস্ত্রের সত্যাসত্যতার কি হইল? ইহা শুনিয়া নৃপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলিলেন। তিনি গোপনে একটী কলসমধ্যে বিষাক্ত সর্প পূরিয়া উহার মুখ বদ্ধ করিয়া সভাতে আনয়নপূর্ব্বক সকলকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন, যাঁহারা এই কলসের মধ্যে কি আছে বলিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগকে আমি পাষাণ-যন্ত্রে বিনষ্ট করিব। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বিবেচনার জন্য একদিন সময় লইলেন এবং পরদিন আসিয়া বলিলেন যে উহার মধ্যে সর্প আছে। আস্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন যে উহার মধ্যে ফণাধরের ফণাতে বিষ্ণু শয়ান আছেন। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ-বাক্য সত্য বলিয়া আকাশ বাণী হইল, এবং কলসের মুখোদ্-ঘাটনপূর্ব্বক সকলে দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ যাহা কহিয়া-ছিলেন তাহাই সত্য। তখন রাজার আদেশে তাঁহার রাজ্য-স্থিত বৌদ্ধকুল নির্মূল হইল। কেহ কেহ পলায়ন দ্বারা

প্রাণরক্ষা করিল। এইরূপে সুধন্বা নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মপরিহার-পূর্ব্বক বেদবোধিত ধর্ম্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতে বৌদ্ধনাম প্রায় বিলুপ্ত হইল। তথাপি ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিত বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আচার্য্য যে এক জন বৌদ্ধের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তাহার ধর্ম্ম শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে বোধ হয় আর কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্দেহ থাকিবে না যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ের মতে শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কেরল প্রদেশে পূর্ণানদীর তীরস্থিত কোন স্থান। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম সুভদ্রা। ইহাঁদের গ্রামে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নামে এক শিবের মন্দির ছিল। শিবগুরু পত্নীর সহিত সেই শিবের বহুকাল আরাধনা করিলে মহাদেব তাঁহাকে বর দিলেন—তিনি শিবগুরুর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। যথাকালে সুভদ্রার গর্ভ হইতে শঙ্করাচার্য্য ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার জন্মকালে পঞ্চ গ্রহ উচ্চসংশ্রয়স্থ এবং অনস্তমিত ছিল। দিব্য পুরুষের জন্মলগ্নেই অনস্তমিত পঞ্চ গ্রহের উচ্চ সংশ্রয় দৃষ্ট হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া বলিলেন যে এই বালক অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, অসংখ্যগুণশালী এবং পবিত্রকীর্ত্তি হইবে। তৃতীয় বর্ষে শঙ্করাচার্য্যের পিতৃবিয়োগ হইল। পঞ্চম বর্ষে উপনীত

কইয়া তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। গুরু-গৃহে অধ্যয়ন-কালে তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য করেন। তিনি একদা ভিক্ষা করিবার জন্য কোন দরিদ্র বিপ্রের ভবনে উপস্থিত হইলে, বিপ্রপত্নী কহিলেন "আমরা দীন ও ভাগ্যহীন, আমাদের কিছুই নাই যে আপনাকে ভিক্ষা দেই। অতএব আপনি এই আমলকী ফলটী গ্রহণ করুন। শঙ্কর ইহা শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই কমলাকে স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেই বিপ্রপত্নীর গৃহ সুবর্ণে পরিপূরিত করিয়া দিলেন। দ্বিজদম্পতী সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইহা শঙ্করের পঞ্চম বর্ষ বয়সের কার্য্য। কিয়দ্দিন পরে গুরুর অনুমতি লইয়া শঙ্কর স্বগৃহে আগমন করিলেন। এই সময়ে একদা গৌতমাদি ঋষিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহার মাতা ঋষিগণকে তাঁহার আয়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অগস্ত্য মুনি বলিলেন "তোমার পুত্রের আয়ু ষোড়শ বর্ষ"। ইহা শুনিয়া তাঁহার জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শঙ্কর তাঁহাকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। তদনন্তর অষ্টম বর্ষে শঙ্কর সন্ন্যাসগ্রহণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মায়াপ্রদর্শনপূর্ব্বক মাতার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একদিন অবগাহন-চ্ছলে নদীতে নামিয়া কুম্ভীরে তাঁহাকে ধরিয়াছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "মাতঃ! যদি

আমার প্রাণরক্ষা আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে অবিলম্বে সন্ন্যাসগ্রহণে আজ্ঞা করুন।” জননী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, “বৎস! তুমি সত্বর সন্ন্যাস গ্রহণ কর।” তখন তিনি জল হইতে উত্থান করিয়া মাতাকে কহিলেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিবামাত্র কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। অনন্তর জননীকে বলিলেন “আপনি যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন তখনই আমাকে নিকটে পাইবেন” এবং ইহা বলিয়া মাতার শোক ভার-লাঘব করিবার নিমিত্ত দূরস্থিত নদীকে শিব-মন্দিরের সমীপস্থ করিয়া দিলেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় অলৌকিক কার্য্য।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি বহুদূর গমন করিয়া নর্ম্মদা-নদী তীর-স্থিত পরমহংস শ্রীগুরু গোবিন্দনাথ স্বামীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অন্তেবাসিত্ব স্বীকার করিলেন। এস্থানে তাঁহার তৃতীয় অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। নর্ম্মদানদীর জলকল্লোল গুরুর ধ্যানের প্রত্যূহস্বরূপ স্থির করিয়া তিনি উহার জল সমাহরণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত কমণ্ডলু-মধ্যে স্থাপন করিলেন। ইহাতে গোবিন্দনাথ স্বামী অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রীত হইয়া শঙ্করকে কাশীপুরীতে গমনপূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে বলিলেন। আচার্য্যের উপদেশানুসারে তিনি কাশীতে গমন করিলেন এবং *বেদান্ত মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই স্থানে সনন্দন নামে এক জন চোলদেশবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইনিই পরে পদ্মপাদ নামে খ্যাত হন। পদ্মপাদ নামের হেতু

এইরূপ লিখিত আছে। একদা গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থিত শঙ্করাচার্য্য পরতীরে দণ্ডায়মান সনন্দনকে তাঁহার সমীপে আসিতে আদেশ করিলেন। সনন্দন গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তিসহকারে গঙ্গার উপর দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলেন। ভক্তি-প্রভাবে তিনি যেখানে যেখানে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেখানে সেখানে এক একটী পদ্ম উদ্ভূত হইয়া তাঁহার পদরক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নাম পদ্মপাদ রাখিলেন। এইটী শঙ্করাচার্য্যের চতুর্থ অদ্ভুত কার্য্য।

কাশীতে অবস্থিতি-কালে তিনি অনেকগুলি শৈবমতা-বলম্বীদিগকে পরাজিত এবং স্বশিষ্য করেন। তদনন্তর তাঁহার ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ ও বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রের অর্থ লইয়া আট দিন বিচার হই-য়াছিল। এ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্বিজয়ের মতে ব্যাস তাঁহাকে তাঁহার আয়ুষ্কাল ৩২ বৎসর হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বারাণসী হইতে তিনি প্রয়াগ যাত্রা করেন এবং সে স্থানে কুমারিলভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রেবাতীরস্থিত মাহিষ্মতী নগরীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। তথায় মণ্ডনমিশ্রের সহিত তাঁহার যে বিচার হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে মণ্ডনপত্নীর সহিত বিচারহেতু শঙ্কর যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়া-ছিলেন তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইটী তাঁহার পঞ্চম অদ্ভুত কার্য্য। তদনন্তর তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহি-

র্গত হইলেন, এবং গোকর্ণাখ্য শিবালয়, হরিহরালয় প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয়ানন্তর স্বমতাবলম্বী করিয়া তাঁহার সুরেশ্বরাচার্য্য নাম দিলেন। তদনন্তর শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কাণাদ, কাপিল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি মত নিরস্ত হইল। দ্বৈতমতাবলম্বীদিগের পক্ষ এককালে বিলীন হইয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য যথাসুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক দিন জনৈক দুষ্ট কাপালিক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় ভক্তিসহকারে ও বিনয়াবনত-ভাবে তাঁহাকে বন্দনা করিল। তৎপরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে নিবেদন করিল, মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর দিয়াছেন যে "তুমি কোন সর্ব্বজ্ঞ বা রাজার মস্তক উপহার দিতে পারিলে সিদ্ধ হইবে"। সে শঙ্করাচার্য্যের মস্তক প্রার্থনা করিল এবং তিনিও তাহা দিতে স্বীকার করিলেন। সেই দুষ্ট কাপালিক তাহার ইষ্টসাধনার্থ একদা শূলহস্তে শঙ্করের নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এইটী সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যান।

শঙ্করাচার্য্য তীর্থ-পর্য্যটনে নির্গত হইয়া হরিহরালয়ের পথে দেখিলেন কোন দম্পতী মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ভয়ানক বিলাপ করিতেছে। তদ্দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সেই মৃত শিশুর জীবনদান করিলেন। তথা হইতে শ্রীবলীক্ষেত্রে

গমন করিলেন এবং সে স্থানে কোন ব্রাহ্মণের এক জড় পুত্র দর্শন করিয়া তাহার পিতার প্রার্থনানুসারে সেই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শিশো! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ জড় হইয়াছ?" বালক বেদান্তার্থগ্রথিত বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করিল। ইহাতে সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং শিশুর পিতা শিশুকে শঙ্করাচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহার নাম হস্তামলক হইল। তদনন্তর আচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শৃঙ্গগিরিতে সমুপস্থিত হইয়া তথায় এক শোভন প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং শারদা দেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। এই স্থলে গির নামে জনৈক গুরুভক্ত ও গুরুপ্রিয় শিষ্য আচার্য্যের শুশ্রূষা করিতেন। ইনিই আনন্দগিরি নামে প্রথিত। ইনি গুরুর কৃপাবলে অশেষশাস্ত্র কুশল হন। এই সময়ে পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর এবং গিরি এই চারিজন শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্যরূপে বিখ্যাত হন। ইহাঁরা সকলেই শাঙ্করভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন। পদ্মপাদবিরচিত টীকার নাম পঞ্চাস্যচরণা বা পঞ্চপাদিকা টীকা। আনন্দগিরির টীকা স্বনাম-খ্যাত। সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। হস্তামলকের টীকাও নিজ নামে বিখ্যাত। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য স্বভবনে মাতার চরণ-দর্শনার্থ গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে দিব্য শরীরে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে মাতার পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

ইতিমধ্যে পদ্মপাদ তীর্থ-দর্শন-কামনায় বহির্গত হইয়া কালস্তীশ্বর, কাঞ্চীক্ষেত্র, পুণ্ডরীকপুর, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গুরুর দর্শনাভিলাষে কেরল-দেশে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি শঙ্করাচার্য্যের মুখ হইতে তাঁহার পঞ্চপাদাচরণা টীকা (যাহা ইতিপূর্ব্বে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল) অবিকল সম্পূর্ণ লিখিয়া লন। আর রাজশেখর নৃপতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ী (ইতিপূর্ব্বে অগ্নিযোগে ভস্মীভূত) শঙ্করাচার্য্যের মুখ হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন। ধন্য স্মৃতিশক্তি! ধন্য মেধা!

দ্বিতীয়তঃ। শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় বিষয়ে মতভেদ। এতক্ষণ যাহা বলা গেল তাহা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। শঙ্করবিজয়ের মত পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। দৈবযোগে এক দিন সুধন্বা নৃপতির সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকার হইল। তিনি রাজাকে বলিলেন "রাজন্! আমি পৃথিবীতে বেদান্তমত প্রচার করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আপনাকে আমার সহায় হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সুধন্বা নৃপতি সসৈন্যে শঙ্করাচার্য্যের সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনন্তর সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য সসৈন্য ভূপতির সহিত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া প্রথমে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে শাক্তমতাবলম্বিগণ তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইল এবং অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। রামেশ্বর হইতে তিনি চোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া কাঞ্চীপুরে সমাগত হইলেন এবং তত্রত্য দ্বৈতবাদা-

দিগকে জয় করিয়া কর্ণাট দেশে প্রস্থান করিলেন। কর্ণাট দেশে তখন কাপালিকদিগের ঘোরতর প্রতাপ ও প্রভাব। ক্রকচ নামে দুরাত্মা কাপালিকগুরু তাঁহাদের নানাবিধ ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সুধন্বা নৃপতি স্বসৈন্য-বলে কাপালিকদিগকে যুদ্ধে হনন করিলেন এবং শঙ্করা-চার্য্যও কতকগুলি কাপালিককে স্বয়ং হুঙ্কার দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। তখন ক্রকচ রোষাবিষ্ট হইয়া নিজ ইষ্টদেব ভৈরবকে স্মরণ করিলেন। স্মৃত হইবামাত্র ভৈরবদেব তথায় আবির্ভূত হইলেন। ক্রকচ তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের বধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভৈরবদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রকচকে শঙ্করাচার্য্যের নিকটে অপরাধের জন্য মস্তক-চ্ছেদন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিলেন এবং শঙ্করকর্তৃক সংস্তুত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে কাপালিক দল নিধন-প্রাপ্ত হইলে শঙ্করাচার্য্য সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া (৭) গোকর্ণ তীর্থে প্রস্থান করিলেন, এবং সে স্থানে ব্রহ্মাদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

তৎপরে ঘোরতর শৈব নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করাচার্য্যের ভয়ানক বিবাদ ও বিচার হয়। অবশেষে নীলকণ্ঠ পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমতগ্রহণ করিলেন। নীলকণ্ঠের পরাজয়সংবাদ শ্রবণে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইল। তদ-নন্তর শঙ্করাচার্য্য দ্বারবতীনগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য

---

(৭) দক্ষিণাবর্ত্তে কোঙ্কণ (Konkana) প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী। পরশুরাম কোঙ্কণপ্রদেশ সমুদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিলেন। তথা হইতে তিনি অবন্তীনগরে যাত্রা করিলেন এবং সে স্থানে প্রথিতনামা দ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। ভাস্করাচার্য্য শিষ্যবর্গ সহিত অদ্বৈত মত স্বীকার করিলেন। তদনন্তর তত্রত্য জৈনদিগকে স্ববশে ও স্বমতে আনয়ন করিয়া শঙ্করাচার্য্য নৈমিষদেশে গমন করিয়া তদ্দেশস্থ পণ্ডিতবর্গকে জয় করিলেন এবং অবশেষে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষমিশ্রকে পরাজিত করিলেন। পরে শিষ্যসঙ্গে সকল দেশ জয় করিতে করিতে শঙ্করাচার্য্য কামরূপে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে শক্তিমতাবলম্বী অভিনবগুপ্তকে পরাজিত করিয়া, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে পণ্ডিতগণকে জয়করণানন্তর গৌড়দেশে গমন করিলেন। তথায় বিখ্যাত মীমাংসাশাস্ত্রপারগ মুরারিমিশ্র এবং ন্যায়শাস্ত্রকোবিদ উদয়নাচার্য্য (৮) শঙ্করাচার্য্যের নিকটে পরাজিত হইয়া বেদান্তমত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শাঙ্করমতের প্রকাশে

---

(৮) উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা। শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনগ্রন্থে কুসুমাঞ্জলির উল্লেখ আছে এবং ইহা হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র স্বকৃত খণ্ডনোদ্ধারগ্রন্থে শ্রীহর্ষের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের উপর ভামতী নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি নবম অথবা দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কাউএল সাহেবের মতে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিগ্রন্থের টীকা লিখেন এবং দ্বাদশশতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মাধবাচার্য্য উদয়নের নাম সম্মানসহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। এমতে শঙ্করদিগ্বিজয়ের কথা অসার হইয়া পড়ে।

অন্যান্য দ্বৈতমত সকল এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বেদান্তমত সর্ব্বত্র আদরণীয় হইতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন এবং আপনাকে কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ভগন্দর-রোগ জন্মে, কিন্তু তিনি শরীরকে তুচ্ছ করিয়া উহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার শিষ্যেরা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে পদ্মপাদ সিদ্ধমন্ত্র জপ দ্বারা উহার আরোগ্য সাধন করিলেন। ইহার পর শঙ্করাচার্য্য গৌরপাদ স্বামীর সহিত সমাগত হন। গৌরপাদ স্বামী তাঁহার গুরু; শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন শুনিয়া তাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন; গৌরপাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের এক অদ্ভুত বার্ত্তিকের রচয়িতা। শঙ্কর গুরুর এই অভিলাষ এবং এতদূর কৃপা দর্শন করিয়া নিজকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্ম-সূত্র, গীতা এবং অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য গুরুকে শ্রবণ করাইলেন। গৌরপাদ স্বামী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণ সহিত কাশ্মীরমণ্ডলে গমন করেন। তথায় কাণাদ, নৈয়ায়িক, কাপিল, সৌগত, জৈন, জৈমিনীয় প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহার তুমুল বিচার হয়। কিন্তু তিনি সকলকে পরাস্ত করিয়া বিদ্যাভদ্রাসন নামক পীঠে (সরস্বতীপীঠে) আরোহণ করেন। রাজতরঙ্গিণীতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাশ্মীরে অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া তিনি শৃঙ্গপর্ব্বতে প্রস্থান

করিলেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া বদরী-কাননে যাত্রা করিলেন। সে স্থানে মহর্ষিদিগের সহিত অদ্বৈত মত লইয়া নানাবিধ আলাপ করেন। এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের বত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইল এবং ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তাঁহাকে কৈলাসে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহপ্রাপ্ত হইলেন এবং সগণে কৈলাসে গমন করিলেন।

পাঠকগণ এক্ষণে শঙ্করবিজয় এবং শঙ্করদিগ্বিজয় এই দুই গ্রন্থের বৃত্তান্ত তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই আমরা পূর্ব্বে গ্রন্থদ্বয়বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মাধবাচার্য্য এবং তদনুসারে সদানন্দ শঙ্করজীবনী যতদূর রঞ্জিত করিতে পারিয়াছেন তাহা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণনার অনেক স্থল অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আনন্দগিরি শঙ্করের প্রিয় শিষ্য এবং বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি অনেক বিষয় জানিতেন না আর পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা তাহা জানিলেন ইহাই বড় আশ্চর্য্য। আমরা উভয় মতেরই সারাংশ মাত্র বিবৃত করিয়াছি। সম্পূর্ণ রূপে বিবৃত করিলে ত দিগ্বিজয় ও দিগ্বিজয়সারের উপর পাঠকের কি প্রকার আস্থা থাকিত তাহা বলিতে পারি না।

আমরা এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ-বুদ্ধি-শক্তি-সম্পন্ন

ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভারতের সমাজে ধর্ম্ম-বিপ্লব নাশ করিতে উদ্যোগী হন। তিনি জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতবর্ষের অবস্থা যে কিরূপে পরিণত হইত তাহা চিন্তার অতীত। তিনি সমাজকে রক্ষা না করিলে সমাজ রসাতলে যাইত এবং ধর্ম্মের মহিমা অধঃপাতিত হইত। তিনি সমাজের পরিত্রাতা, ভারতের ধর্ম্মবীর এবং নাস্তিকগণের ত্রাস। তাঁহার দিগ্বিজয় রামায়ণের বা মহাভারতের দিগ্বিজয় নহে, ইহা সমগ্র ভারতের ধর্ম্মসংস্কার, সমগ্র ভারতের নাস্তিকতা নিবারণ এবং সমগ্র ভারতে শুদ্ধ অদ্বৈত মতের প্রচার। তাঁহার শুদ্ধ অদ্বৈত মত ইদানীং ভারতের অনেকত্র প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু ভারতের এমন কোন আর্য্যধর্ম্ম নাই যাহা শঙ্করের অদ্বৈত মতের কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বধর্ম্মে তিনি তাঁহার মতের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের কোন ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারিবেন না যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ধার ধারেন না। কেবল বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকগণ অনেক পরিমাণে তাঁহা হইতে স্বাধীন আছেন।

তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? কেহ কেহ বলেন তাঁহার মন অতি অনুদার, অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি কেবল ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যান্য জাতিদিগের জন্য কিছুই ভাবিতেন না। উজ্জয়িনী-বাসকালে তিনি এক জন কাপালিককে বলিয়াছিলেন যে দুষ্ট ব্রাহ্মণ দমন তাঁহার উদ্দেশ্য, সমাজের অন্যান্য জাতিরা ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিবে। ইহা দ্বারা এমন বুঝায় না যে ব্রাহ্মণ

ভিন্ন জাতিদিগের ধর্ম্ম সংস্কার তাহার অভিপ্রেত ছিল না। এবং ইহাও বলা যায় না যে তাঁহার মন শাক্যসিংহের মনের ন্যায় প্রশস্ত ছিল। শাক্যসিংহের সমাজ-সংস্কারের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ও অন্যায় একাধিপত্য; কিন্তু শঙ্করের সমাজ-সংস্কারের প্রধান কারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা মত প্রচার এবং ব্রাহ্মণদিগের ভ্রষ্টাচার। তাঁহার সংস্কার বেদ উপনিষৎ বজায় রাখিয়া, বুদ্ধের সংস্কার বেদাদি শাস্ত্র রসাতলে দিয়া। এক জন ব্রাহ্মণদিগের উপর চটিয়া সংস্কারক হন; অপর জন ব্রাহ্মণদিগের ভ্রষ্টাচারে দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচার্য্যের সংস্কার অল্লায়ত নহে, কিন্তু অল্পের মধ্য দিয়া লোকায়ত। যাহা হউক, তিনি ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার না হইলে আজ ভারতে বোধ হয় হিন্দু-ধর্ম্মের গন্ধও থাকিত না। তাঁহার দিগ্বিজয় কি প্রকারে হইয়াছিল? বহুসংখ্যক শিষ্যগণ সহিত তিনি দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বোধ হয় অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ দ্বারা পরপক্ষ নিরস্ত করিতেন। শঙ্করবিজয়ে দুই স্থলে বলপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কাপালিক-সমাগমে এবং ব্যাস-শঙ্কর-সংবাদে। দিগ্বিজয়সারে কাপালিকদিগের সহিত সুধন্বা নৃপতির বাস্তবিক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ব্যাসের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার শঙ্করাচার্য্যের অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ বিশ্বাস যে, তিনি অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেন, নতুবা তিন চারি সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা কি? ছলে, বলে, কৌশলে, যেরূপে পারিতেন

সেই রূপেই পরপক্ষ নিরস্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শাস্ত্র নখদর্পণ ছিল, কখন তর্ক করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কি আর্য্য, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি কাপালিক, সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রই তাঁহার সম্যক্ অভ্যস্ত ছিল। আর তিনি এত বিশদভাবে নিজ মত প্রকটন ও বিপক্ষ-মত খণ্ডন করিতেন যে তাহাতে তাঁহার বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধা করিত। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তিনি সাংখ্যাদি যে সকল মত নিরসন করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতভাষাবিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তাঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, সরস এবং হৃদয়-গ্রাহী। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার রচনাপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি আর কোন কার্য্য না করিয়া কেবল শারীরক ভাষ্য লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। যত দিন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের লেশমাত্র এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা থাকিবে, তত দিন শঙ্করাচার্য্যের নাম কখন ভারত হইতে বিস্মৃত বা বিলুপ্ত হইবে না।

এক্ষণে আমরা গ্রীসীয় দার্শনিক প্লেটোর এবং জার্ম্মান দার্শনিক স্পিনোজার মতের সহিত অদ্বৈতমতের তুলনা করিয়া প্রস্তাব উপসংহৃত করিতেছি। অদ্বৈতমতকে শাঙ্করমত বা বেদান্তমতও বলে। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, নান্যদস্তি কিঞ্চন" অথবা "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বাক্যগুলি ইহার ভিত্তিভূমি। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মব্যতীত আর কোন পদার্থেরই প্রকৃত

সত্তা নাই। কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ বস্তু, অন্য সমস্তই অসৎ। জগৎ অসৎ, মায়াকল্পিত। যেরূপ অন্ধকার রজনীতে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অথবা যেরূপ দূর হইতে একখণ্ড শুক্তিকাতে রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগতে জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়। যখন এই ভ্রম বিদূরিত হইবে, যখন তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়কে আলোকিত করিবে, তখনই আমাদের "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নান্যদস্তি কিঞ্চন", সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে এবং আমরা মুক্ত হইব।

একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ এবং মূল কারণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং", ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ; তিনি সত্যস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ; তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। তিনিই সত্তার আদিজনক, তিনিই জ্ঞানের আকর এবং তিনিই আনন্দের নিদান। ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ স্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার সময় হইতে প্রচলিত। উপনিষদে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ লক্ষিত হয়। তখন অন্য কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সমাজে ঈশ্বরের ত্রিবিধ স্বরূপ ইহার সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। তাঁহারাও পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন স্বরূপ স্বীকার করেন। পিতা সৎস্বরূপ বা সত্তার আদিস্রষ্টা, পুত্র চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানের আকর এবং পবিত্র আত্মা আনন্দস্বরূপ বা আনন্দের আদি। অনেক মিসনরী মহোদয় বলেন যে তাঁহাদের ত্রিবিধ স্বরূপ হইতে আর্য্যদিগের ত্রিবিধ স্বরূপ অপহৃত। এ কথা কত দূর সঙ্গত তাহা বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। উপনিষদ্

বাইবেলের অনেক পূর্ব্বের সামগ্রী। পরব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য এবং মনের অগোচর। ইহা বাক্য দ্বারা বিবৃত করা যায় না; মনেও ইহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। তিনি অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয় এবং অনাকলনীয়। তিনি জগৎ সৃজন করিতে কামনা করিয়া সঙ্কল্প মাত্রে ইহার সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টির কারণ অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞান। ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন এবং জগৎ উৎপাদন করিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহা না করিতেও পারিতেন। কেন তাঁহার ইচ্ছা হইল এ প্রশ্নের উত্তর কেহ জানে না।

এই অবিদ্যাবশতঃই আমরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রভেদ বুঝিতে পারি না এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ভৌতিক শরীর এবং মনকে প্রকৃত বস্তু—সৎ পদার্থ বলিয়া মনে করি। বেদান্তদর্শন এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিরাস করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে কোন ভেদ নাই তাহা বুঝাইয়া দেয়। এই অবিদ্যার ঘোর কাটিয়া গেলে আমাদের আর এই সকল ভ্রম থাকিবে না। তখন আমরা 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিব।

শঙ্করাচার্য্যের মতে মনুষ্য নিত্য কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইবে এবং কর্ম্মসমুদায় পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন যে সন্ধ্যোপাসনাপ্রভৃতি বেদবোধিত নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট এবং প্রীত হন এবং অদ্বৈত জ্ঞানালোক প্রদান করেন।

যদিও শঙ্করাচার্য্য জগতের বস্তু-সত্তা স্বীকার করিতেন না কিন্তু তিনি ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে বলিতেন না। তাঁহার মতে জগৎ প্রভৃতির পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা আছে। ঈশ্বরের সত্তা পারমার্থিক। ইহা কেহই স্বীকার করেন না যে ঈশ্বরের সত্তা এবং জগৎপ্রভৃতির সত্তা একপ্রকার। জগদাদি সমস্ত অনিত্য, কিন্তু ঈশ্বর নিত্য। অতএব আমরা বলিতে পারি না যে জগৎ কিছুই নহে। ইহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই যাহা দেখিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি, তাহা কখন একবারে মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জগৎ এবং ঈশ্বর একরূপ-সত্তা-বিশিষ্ট বলিলে বিষম ভ্রম হইবে।

অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি বেদান্তমতের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে উপেক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন যে বেদান্ত দর্শন আমাদের নীতিসম্বন্ধীয় এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকলের সম্পাদন-পথের কণ্টকস্বরূপ। যদি পৃথিবী কিছুই না হয়, এবং আমরাও কিছুই না হই, তবে আর কোন কর্ম্মে উৎসাহ হইতে পারে না, কোন বিষয়ের উন্নতিসাধনে যত্ন হইতে পারে না! অথবা আমাদের আত্মা ও পরমাত্মা যদি এক হয়, যদি আমরা ব্রহ্ম ভিন্ন না হই, তবে আর আমাদের উন্নতির চেষ্টা অনাবশ্যক। কিন্তু এগুলি বিষম ভুল। জীবাত্মা অজ্ঞান-তিমির ভেদ করিতে পারিলে তবে পরমাত্মার সমান হইবে। এই অজ্ঞান-তিমির নাশ করিবার জন্য আমাদের সযত্ন এবং সচেষ্ট হওয়া উচিত। জ্ঞান-বৃদ্ধিসহকারে আমরা উন্নত হইব

ইহা সামান্য প্রোৎসাহ নহে। যতই জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে ততই আমাদের উৎকর্ষ, ততই আমাদের উন্নতি। এই উন্নতির ফল ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য বা সহযোগ। জ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। জ্ঞানবৃদ্ধি হইলেই আমাদের ধর্ম্ম এবং নীতির উন্নতি হইবে। এই উন্নতি ক্রমে আমাদিগকে পরব্রহ্মে লইয়া যাইবে—এই আশা-জনক এবং উৎসাহজনক বাক্য শুনিলে কাহার না মনে আনন্দ হয় এবং কোন্ ব্যক্তি না উন্নতির পথে ধাবমান হন। জ্ঞানেই উন্নতি। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই নীতি এবং ধর্ম্ম। সুতরাং বেদান্ত দর্শন নীতি এবং ধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ নহে, বরং উত্তেজকস্বরূপ। কিন্তু না বুঝিতে পারিলে অমৃতও গরল হয়। বেদান্ত মতের অযথা ব্যবহার করিলে যে বিষময় ফল লাভ হয় তাহার দোষ বেদান্তদর্শনের নহে, নির্ব্বোধ ব্যবহারীর। যথা-ব্যবহৃত হইলে বেদান্তমত অনেক অমৃতময় ফল প্রসব করিবে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বেদান্ত মত কিছু দুর্ব্বোধ। লোকে ইহাকে যত সহজ মনে করে, তদপেক্ষা বিলক্ষণ কঠিন। সুতরাং ইহা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগের অতি সতর্ক-ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। একটু তাড়াতাড়ি করিলেই সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে।

একণে এই মতের সহিত প্লেটোর (Plato) মায়াবাদ (Idealism) কতদূর মিলে দেখা যাউক। ভাবনা-মত (Theory of Ideas) প্লেটোর দর্শনের মধ্য-বিন্দুস্বরূপ। ভাবনা (Idea) আদর্শস্বরূপ এবং বাহ্য পদার্থ সকল ছায়া-

মাত্র। সৎ পদার্থের ভাবনাই (Idea of the Good) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবনা। ইহাই পরমেশ্বর। এই দৃশ্যমান জগৎ ভৌতিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কারণ ইহা সৃষ্ট। ভূত-পদার্থ (Matter) সর্ব্বতোভাবে নিগুর্ণ এবং বস্তুতঃ অসৎ। ভৌতিক জগতেরও কোন বস্তু-সত্তা নাই। ঈশ্বর পরম কারুণিক, সত্তম এবং রাগদ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত। তিনি সদিচ্ছাতেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল জ্ঞান বা কেবল আনন্দ উৎকর্ষের চরম সীমা নহে। পরমেশ্বরের সহিত যতদূর সম্ভব সাযুজ্য বা সাদৃশ্যই উন্নতির পরা কাষ্ঠা। পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায় বা দণ্ডের আশঙ্কায় ধর্ম্ম আচরণ করা উচিত নহে। কিন্তু ধর্ম্মই আত্মার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বলিয়া ধর্ম্মের আলোচনা আবশ্যক। এই অংশগুলি শাঙ্কর মতের মধ্যে অনেক পরিমাণে দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর আছে, তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

অতঃপর স্পিনোজার মত। ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) ১৬৩২ খৃঃ অব্দে আমষ্টার্ডাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৭৭ অব্দে হেগ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ডেকার্ট (Des Cartes) নামা দার্শনিকের দ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদে পরিণত করেন। তাঁহার মতে পদার্থ একমাত্র, দ্বিতীয় নাই। এই একমাত্র পদার্থ ঈশ্বর। যাহা অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাপনি বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং অন্যের সাহায্য ব্যতীত যাহার ভাবনা স্বতই হইতে পারে, তাহাকে পদার্থ

অন্য কোন বস্তুর ভাবনা ব্যতীত যাহার ভাবনা করা যাইতে পারে, তাহাই পদার্থ। স্পিনোজার মতে ইহাই পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ। পরমেশ্বরই একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ। ইহার দুইটী সর্ব্বপ্রধান গুণ আমাদের জ্ঞেয়;—জ্ঞত্ব এবং ব্যাপিত্ব, জ্ঞান এবং বিস্তৃতি। স্পিনোজার মতে জ্ঞত্বরহিত কোন ব্যাপক বা বিস্তৃত পদার্থ নাই। ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ। ঈশ্বর স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। জ্ঞানের বৃদ্ধি সহকারে আমরা ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করিব। ঈশ্বর-প্রীতিই সুখ এবং স্বাধীনতা। মুক্তি ধর্ম্মের পুরস্কার নহে; কিন্তু মুক্তিই প্রকৃত ধর্ম্ম। অতএব আমরা মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান হইব। স্পিনোজার অদ্বৈতমত এবং শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত কতক অংশে একরূপ।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের যে মহোপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমস্ত ভারতই তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ রহিয়াছে। ভারতবর্ষে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

জৈনধর্ম্মবীর

মহাবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মহাবীর জৈনদিগের চরম তীর্থকর (১) বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্তই অনেকে তাঁহাকে বিশেষরূপে শ্রমণ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনচরিত কল্পসূত্রে বর্ণিত আছে। জৈনদিগের অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তকের ন্যায় কল্পসূত্রও প্রাকৃত মাগধী ভাষাতে লিখিত। ইহার মতে মহাবীর দেবত্ব এবং দেব-সম্বন্ধীয় সুদীর্ঘ জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভের নিমিত্ত তীর্থঙ্কররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময় জৈন চতুর্থ যুগের ৭৫ বৎসর অবশিষ্ট ছিল।

---

(১) জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ কতকগুলি সিদ্ধপুরুষকে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা এবং আরাধনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা দুঃখ-সঙ্কুল সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তীর্থকর, তীর্থঙ্কর বা পারগত নামে অভিহিত। উপর্য্যুপরি বহুবার জন্মগ্রহণ করিবার পর অবশেষে কঠোর তপস্যাপ্রভৃতির বলে তীর্থকরত্ব লাভ হয়। তীর্থকরগণ সকল দেব ও মনুষ্যের পূজ্য, এই নিমিত্ত অর্হৎ নামে কীর্ত্তিত এবং রাগদ্বেষাদি সমস্ত রিপু জয় করিয়া আত্মেশ্বর ও সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন বলিয়া জিন বা জিনেশ্বর নামে খ্যাত। ইঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বদর্শিতা, আপ্ততা, রাগাভাব প্রভৃতি অনেকগুলি লোকাতিগ গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঁহাদের সং[illegible] চতুর্বিংশতি। পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম এবং মহাবীর [illegible] তীর্থঙ্কর।

মহাবীর প্রথমে ঋষভদত্তনামক কোন এক ব্রাহ্মণের পত্নী দেবানন্দার গর্ভে আবির্ভূত হন। ঋষভদত্ত জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণকুণ্ড গ্রামে বাস করিতেন। দেবানন্দা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মেরুর দক্ষিণ প্রদেশের অধীশ্বর এবং স্বর্গীয় সৌধর্ম্মাখ্য-বিভাগ নিবাসী ইন্দ্রদেব এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মহাবীরের চরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জিন বলিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এতাদৃশ মহাজনের ঈদৃশ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক-বংশে জন্ম-পরিগ্রহ অনুচিত। সুতরাং নিজ প্রধান অনুচর হরিনৈগমেষীকে দেবানন্দার গর্ভস্থ মহাবীরকে কাশ্যপগোত্রজ ইক্ষ্বাকুবংশীয় সিদ্ধার্থ রাজার মহিষী ত্রিশালা দেবীর গর্ভে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে সমস্ত সম্পন্ন হইলে পর ত্রিশালা দেবী স্বপ্নে সকল বিষয় জানিতে পারিলেন। পরে গণকেরা রাজাকে জানাইলেন যে, চরম জৈন মহাপুরুষ রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। যথাকালে মহাবীর ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রবাদ আছে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী মহাবীরের জন্মতিথি। সিদ্ধার্থ ভারতবর্ষের অন্তর্গত পাবন নামক প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে সন্তানের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন। কিন্তু পরে সন্তানকে অশেষশক্তিমান্ দেখিয়া তাঁহাকে মহাবীর এই নাম প্রদান করেন। যেমন মহাবীরের তিনটী নাম

সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তদ্রূপ সিদ্ধার্থ রাজারও তিনটী নাম ছিল—সিদ্ধার্থ, শ্রেয়াংশ এবং যশস্বী। ত্রিশালা দেবীরও তিনটী ছিল, যথা—ত্রিশালা, বিদেহদিন্না এবং প্রীতিকারিণী। পিতা মাতা এবং পুত্র প্রত্যেকেরই যে তিনটী করিয়া নাম ছিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মহাবীরের পিতৃব্যের নাম সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দবর্দ্ধন এবং ভগিনীর নাম সুদর্শনা।

মহাবীর যশোদানাম্নী কোন কামিনীর পাণিপীড়ন করেন। যশোদা দেবী সমবীর নগরের রাজার কন্যা। যশোদা দেবীর গর্ভে মহাবীরের এক কন্যা জন্মে। ইহার দুইটী নাম রাখেন, অনোর্জ্জা এবং প্রিয়দর্শনা। জামলি নামক এক শিষ্যের সহিত প্রিয়দর্শনার পরিণয় হয়। মহাবীরের দৌহিত্রীর দুইটী নাম রাখা হয়, শেষবতী এবং যশোবতী।

মহাবীর-চরিত নামক জৈন গ্রন্থে মহাবীরের বহু জন্ম গ্রহণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ আট বার জন্ম পরিগ্রহের উল্লেখ আছে।

১। মহাবীর বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে জন্মিয়া ন্যায়সার নামে খ্যাতিলাভ করেন।

২। তিনি প্রথম তীর্থকর ঋষভ দেবের পৌত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মরীচি নামে অভিহিত হন।

৩। তিনি ইন্দ্রিয় সুখ-নিরত সংসারী ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

৪। তিনি বেহারদেশান্তর্গত রাজগৃহ নামক স্থানের রাজ- বিশ্বভূত নামে বিখ্যাত হন।

৫। তিনি বহুদেব ত্রিপিষ্টপ নামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নানা কুকার্য্যে রত হইয়া বহুপরোনাস্তি কষ্টভোগ করেন।

৬। তিনি সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৭। তিনি মহাবিদেহ (মিথিলা ?) দেশে প্রিয়মিত্র চক্রবর্ত্তী নামে জন্মেন।

৮। তিনি ভারতবর্ষের অধিপতি জিতশত্রুর তনয়রূপে জন্মলাভ করিয়া নন্দন নামে বিখ্যাত হন। এই জন্মে তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং পরজন্মে মহাবীর নামে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থংকরত্ব প্রাপ্ত হন।

মহাবীরের অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। জনক জননীর মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দবর্দ্ধনের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করেন। তাঁহার এই কার্য্য কি দেবগণের, কি মনুষ্যগণের, সকলেরই অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাহার তপশ্চর্য্যা এবং দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া তিনি বৎসরদ্বয় কঠোর তপস্যা করিলেন। তৎপরে স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে ও চিরাভিলষিত জিনত্ব লাভ করিতে নিতান্ত চেষ্টিত হইলেন।

বহুদিনপর্য্যন্ত তিনি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন এবং নেত্রদ্বয় নাসাগ্রবর্ত্তী করিয়া মৌনব্রত ধারণ রাখিতেন। তাঁহার এই সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধন-কালে ইন্দ্রদেব এক যক্ষকে তাঁহার শরীররক্ষার্থে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে

কিয়দ্দিন গত হইলে রাজগৃহপ্রদেশান্তর্গত কোন গ্রামনিবাসী গোশাল নামক চঞ্চলস্বভাব এক ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুচর হইল। এই ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপর লোক-দিগের সহিত বিবাদ ঘটাইত। অনন্তর তিনি বিহারের অন্তর্গত শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি বিবিধ জনপদ পর্য্যটন করেন এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও স্বমতপ্রচারার্থে উপস্থিত হন। অতঃপর মহাবীর কৌশাম্বী-নগরে প্রস্থান করেন। তৎকালে ঐ নগরের অধিপতি শতা-নীক। এ স্থলে মহাবীর অত্যন্ত সমাদৃত হইলেন এবং অনেকে তাঁহার মত অবলম্বন করিল। এই স্থানেই তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল কৃচ্ছ্রসাধনে যাপন করিয়া অবশেষে সাংসারিক কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করেন। এই সময় তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশীভূত হইল এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইলেন।

এই প্রকারে ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সর্ব্বক্লেশ হইতে একবারে মুক্ত হইলেন। এই ঘটনা বিহার-দেশান্তর্গত অপাপপুরী নামক স্থানের রাজা হস্তিপালের রাজধানীতে ঘটিয়াছিল। তৎকালে জৈনদিগের অবসর্পিণী কালের দুঃখমা সুখমা নামক চতুর্থ যুগের প্রায় চারি বৎসর অবশিষ্ট ছিল।(২)

---

(২) ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে কল্পসূত্র রচিত হয়। ইহা গুর্জ্জরদেশনিবাসী ভদ্রবাহুর কৃত। গুর্জ্জরের ধ্রুবসেন রাজার সময়ে ভদ্রবাহু বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব মহাবীর ৫৬৯ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। ভদ্রবাহুর এই কথায়। অর্থাৎ মহাবীরের মৃত্যুর ৯৮০ বৎসর পরে কল্পসূত্র লিখিত হয়) এতটুকু ঐতিহা[illegible]

মহাবীরের সংসার-মুক্তির ৯৮০ বৎসর পরে কল্পসূত্র রচিত হয়। মহাবীর যৎকালে নিজ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন মগধ দেশে বেদচর্চ্চা প্রবল ছিল, এবং অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া তৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছিলেন। এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে মহাবীরের বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক জৈন ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গণাধিপ বা গণধর নামে খ্যাত হইয়া জৈনধর্ম্মপতাকা ভারতের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান করিতে সংকল্প করিলেন। মহাবীরের একাদশ জন শিষ্য ছিলেন, যথা—ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি, বায়ুভূতি, ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মণ্ডিতপুত্র, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলব্রত, মৈত্রেয় এবং প্রভাস। ইহাঁদিগের মধ্যে দুই জন মাত্র মহাবীরের মোক্ষের পর জীবিত ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম ইন্দ্রভূতি এবং সুধর্ম্ম। ইহাঁরা মহাবীরের মুক্তির পর মুক্তি লাভ করেন। কল্পসূত্রানুসারে সকল যতি এবং সন্ন্যাসী সুধর্ম্মের শিষ্যপরম্পরার অন্তর্গত, ফলতঃ আর কোন শিষ্যের শিষ্য ছিল না।

ইন্দ্রভূতির অপর নাম গৌতম। এই নাম সাদৃশ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জৈনগণ বৌদ্ধ গৌতমকে মহাবীরের শিষ্য

মূল্য আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। কল্পসূত্র জৈন-শাস্ত্রনিবহের শিরোভূষণ এবং জৈনদিগের অতিশয় আদর ও বাধনার বস্তু।

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইন্দ্রভূতি গৌতমগোত্রোৎপন্ন মগধ-নিবাসী বসুভূতিনাম্না কোন ব্রাহ্মণের পুত্র, এই নিমিত্তই তাঁহার গৌতম-সংজ্ঞা হয়। অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি তাঁহার সহোদর। মহাবীর যৎকালে মগধ প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তৎকালে ইহাঁরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্যক্ত এবং সুধর্ম্ম উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্য-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন। মণ্ডিতপুত্র অথবা মণ্ডিক এবং মৌর্য্যপুত্র উভয়েই ব্রাহ্মণ এবং সহোদর। অকম্পিত গৌতমগোত্রজ মৈথিল ব্রাহ্মণ। মহাবীর যখন বৈশালী প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় অকম্পিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট তিন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন স্থলে অচলব্রত এবং মৈত্রেয় এই নামদ্বয়ের পরিবর্ত্তে "অচলভ্রাতা" এবং "মেতার্য্য" নাম-দ্বয় দৃষ্ট হয়।

উপরি উক্ত একাদশ জনই মহাবীরের সহিত বিষম বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। মহাবীর স্পষ্টাক্ষরে বিশদরূপে তাহাদিগকে বুঝা-ইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আধার হইতে পারে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়-নাশে ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের নাশ হয় না; কর্ম্মের সত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু পাপ পুণ্যের উৎপত্তি এবং পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের ফল দেখিতে পাওয়া যায়; পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের আধারস্বরূপ জীবপদার্থ অবশ্যই বর্ত্তমান আছে, যেহেতু পাপ পুণ্যের ফলভোজন-

হইয়া থাকে এবং জীব না থাকিলে কে ফলভোগ করিবে? পরলোকের অস্তিত্ব অবশ্য মানিতে হইবে। এইরূপে বিবিধপ্রকার সন্দেহ-নিরসন দ্বারা মহাবীর তাঁহাদিগের মন এত বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হন।

মহাবীর অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা মনুষ্যের উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া দেহের উপর স্বয়ং কোন অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যের শরীরের প্রতিও যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতে হইবে, নিজের শরীরের প্রতিও তদ্রূপ করিতে হইবে। এই পরম বাক্য অনুসরণ করিয়া তিনি যখন বজ্রভূমি, শুদ্ধভূমি প্রভৃতি অসভ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তত্রত্য অসভ্য জাতিদিগের কটূক্তি এবং প্রহার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপর তাঁহার অসন্তোষ বা ক্রোধের লেশমাত্রও উদয় হয় নাই। তিনি বলিতেন, সুনৃত বাক্যের ন্যায় উপাদেয় পদার্থ জগতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না; সর্ব্বদা সত্যভাষী হওয়া উচিত, মিথ্যা কথা বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অন্য ব্যক্তির কোন সামগ্রী অপহরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। সংসারের শেষ সীমা নাই; সংসার-ক্ষেত্রের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে সেই দিকই অনন্ত অপার দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই মায়া-মরীচিকায় প্রলোভিত হইবে। জীব বিবেক-শক্তির যথোচিত পরিচালনা করিতে এবং সর্ব্বক্ষণ অবহিতচিত্তে ...ন করিতে সক্ষম হয় না এবং তন্নিমিত্তই মায়াজালে

জড়িত হইয়া পড়ে। মায়াজালে জড়িত হইলে জীব পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে। অতএব যদি আমরা উন্নতির আশা করি, তাহা হইলে বিবেকশক্তির চালনাপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের ফলাফল বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং মায়াজাল ছেদন করিতে যত্নশীল হইব। সুতরাং সংসার-সাগরে বিবেক-শক্তি একমাত্র তরণী। মহাবীরের মহাবাক্যটী এই,—

সংসার-সাগরে আছে বিবিধ তরঙ্গ;
বিবেকী তরিতে পারে, অবিবেকীর আতঙ্ক।
বিবেক-তরণী তাহে, মায়া সে ভুজঙ্গ,
কল্মষ-হুতাশ তাহে কখন করে কি রঙ্গ॥

কোন্ ব্যক্তি জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহার নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান কালের প্রথম অর্হৎ ঋষভদেব। কিন্তু যখন জৈনশাস্ত্রকারগণই ঋষভদেবের পূর্ব্বে অন্য অর্হৎগণের উল্লেখ করিতেছেন, তখন ঋষভদেবকে কখনই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বকালের প্রথম অর্হৎ কেবলজ্ঞানী যদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতেন, তাহা হইলে জৈনগণ তাঁহার পূজা করিতেন এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতেন। কিন্তু জৈনেরা তাঁহার পূজাও করেন না, কিংবা তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকারও করেন না, কোন কালে তাঁহার পূজা চলিত ছিল কি না তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতএব যখন পূর্ব্বকালের প্রথম অর্হৎ জৈনসম্প্রদায়মধ্যে মান্য ও গণ্য নহেন, তখন তাঁহাকে কোন কারণেই জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যায় না। ইদানীন্তন-

কালীন জৈনগণও কেবল কোন এক অর্হৎকে পূজা করেন না; তাঁহাদিগের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন শ্রেণী পার্শ্বনাথকে পূজা করেন এবং কোন শ্রেণী মহাবীরকে পূজা করেন। যাঁহারা পার্শ্বনাথ দেবকে পূজা করেন তাঁহাদিগের মতে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। যাঁহারা মহাবীরকে অর্চ্চনা করেন তাঁহারা মহাবীরকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া স্বীকার করেন। জৈনশাস্ত্রে জিন বংশের বর্ণনাকালে উল্লিখিত হইয়াছে যে পার্শ্বনাথ (৩) ত্রয়োবিংশতিতম অর্হৎ এবং মহাবীর চতুর্বিংশতিতম অর্হৎ। পার্শ্বনাথ শতবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সমেৎশিখরে এবং মহাবীর ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অপাপপুরীতে মুক্তিলাভ করেন। কল্পসূত্রানুসারে এই দুই ঘটনার মধ্যে ২৫০ বৎসর ব্যবধান ছিল। পার্শ্বনাথের শিষ্যগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু মহাবীরের শিষ্যগণ দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ থাকিত। উভয় দলের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না। উভয় দলের লোক একত্র হইলেই বিবাদ ঘটিত। মহাবীরের সহচর গোশাল পার্শ্বনাথের শিষ্যদিগের সহিত কেবল বিবাদ করিত। বিবাদের প্রধান কারণ

---

(৩) পার্শ্বনাথ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অশ্বসেন রাজার পুত্র। বারাণসীর নিকটস্থ ভেলপুরা ইহঁার জন্মস্থান। ইনি ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকাল হইতে সপ্ততি বৎসর ক্রমাগত তপস্যা করিয়া সংসারমুক্ত হন। সমেৎশিখর বঙ্গদেশে হাজারিবাগ জিলায় পার্শ্বনাথ পর্ব্বত নামে বিদিত। কল্পসূত্রানুসারে ৮২০ পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে পার্শ্বনাথ মুক্তিলাভ করেন। পার্শ্বনাথের ধ্বজ সর্প। জৈনদিগের ইক্ষ্বাকুবংশ সূর্য্যবংশ নহে।

পরিধেয়-বস্ত্র-ভেদ মাত্র। মহাবীরের জীবনবৃত্ত মহাবীর-চরিতে বর্ণিত আছে। পার্শ্বনাথ-চরিতেও পার্শ্বনাথের তীর্থঙ্করত্ব লাভের উপযোগী সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে। অতএব ইহঁদিগের মধ্যে একজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিতীয় জনকে জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিতে সাহসী নহি। আমাদিগের মতে জৈনধর্ম্মের আদিম প্রবর্ত্তকের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বহুদিন জৈন ধর্ম্মের মতসমূহ সমাজে চলিতে আরম্ভ হইলে পর পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হন এবং নিজক্ষমতা-বলে সমাজকে স্বকরস্থিত করিয়া নিজের সম্প্রদায় চালাইয়া যান। তৎপরে মহাবীর নিজের বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া স্বনামের গরিমা সাধন করেন এবং সমাজের অনেকে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এইরূপে সম্প্রদায়-ভেদে দুই জন প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাঁরা প্রবর্ত্তক নহেন, সমাজের নেতৃস্বরূপ। ইহাঁদিগকে দলপতি বলিলেও কোন দোষ হয় না। বুদ্ধদেব যেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তদ্রূপ জৈন ধর্ম্মের কোন প্রবর্ত্তক দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ স্থলে জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ বিষয়ে দুই চারি কথা নিরর্থক হইবে না। মহাবীর শিষ্যদিগের সহিত গঙ্গার উভয়তীরস্থিত প্রদেশসমূহে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিহার, প্রয়াগ, কৌশম্বী, রাজগৃহ, অপাপপুরী প্রভৃতি স্থানে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবিতকালে সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল সুধর্ম্ম এবং গৌতম তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন। গৌতম

শীঘ্রই মানবলীলা সংবরণ করেন। একমাত্র সুধর্ম্মই জৈনমত বিষয়ে উপদেশ দিতে অবশিষ্ট ছিলেন। সুধর্ম্মের প্রধান শিষ্য জম্বুস্বামী, এবং তদনন্তর তাঁহার শিষ্যগণ, জৈনধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হন। মহাবীরের সময় হইতে জৈনদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-বন্ধন হইবার সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই স্বস্ব প্রধান হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় বন্ধন করেন। এইরূপে জৈনদিগের মধ্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া উঠে।

জৈনেরা দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বরদিগের পরিধানবাস ছিল না বলিয়া তাহা-দিগকে দিগম্বর বলিত। দিগম্বর জৈনগণ আপনাদিগকে মহাবীরের শিষ্য বলিয়া অভিমান করে। ইদানীং ইহারা রক্তাম্বর বা রক্তপট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ ইহারা এক্ষণে আহার-কাল ব্যতীত অন্য সকল সময়ে রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিগম্বরেরা শ্বেতা-ম্বরদিগের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া থাকে। দিগম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসনভূষণপ্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাখে না। ইহারা ষোড়শবিধ স্বর্গ এবং শতবিধ স্বর্গস্থ ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। ইহারা সম্মার্জ্জনী বা জলপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না। কিন্তু শ্বেতা-ম্বর জৈনগণ শ্বেত বসন পরিধান করে এবং আপনাদিগকে পার্শ্বনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। শ্বেতাম্বর জৈনেরা তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি সকল বসনভূষণাদিতে ভূষিত করিয়া

স্বীখে এবং সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী স্বর্গ ও চতুঃষষ্টিসংখ্যক ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী এবং জল-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এরূপ করিবার তাৎ-পর্য্য এই যে, অজ্ঞাতসারে কোন জীবের প্রাণহিংসা নিবারণের জন্য তাহারা হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা কোন স্থান পরিষ্কার করিয়া তবে তথায় উপবেশন করে। কমণ্ডলু করিয়া জল লইবার প্রয়োজন এই যে, অন্য-প্রদত্ত জল পান করিতে হইলে, যদি সেই জলে কীটাদি কোন জীব থাকে তাহা হইলে তাহারা জীবহিংসা করিবে এবং তজ্জন্য পাপগ্রস্ত হইবে। ইত্যাদি নানা বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবংবিধ মতভেদ আছে বলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সময় ঘোরতর বিবাদ হইয়া থাকে। উপরি উক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত জৈনদিগের সাধারণতঃ যতি এবং শ্রাবক এই দুই সম্প্রদায় আছে। যতিগণ উদাসীন এবং যোগী। ইহারা কেবল ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী দ্বারা জীবন-যাপন করে, কোনপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ভাল বাসে না, স্ত্রীলোকদিগের সহবাস ঘৃণা করে এবং লোকালয়-শূন্য প্রদেশে মঠরচনা করিয়া তথায় বাস করে। ইহারা "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম," মত অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রদর্শন করে। ইহারা সম্মার্জ্জনী দ্বারা উপবেশনস্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় উপবেশন করে। ইহারা কখনও জৈন মন্দিরের পুরো-হিত হয় না। পৌরোহিত্য কার্য্য প্রায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যতিরা পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে না বটে, কিন্তু জৈন মন্দিরে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে।

শ্রাবকেরা সংসারী। শ্রাবকগণ যতিদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এই তীর্থঙ্করদ্বয়ের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করে। শ্রাবকেরা অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার অনুকরণ করে। শ্রাবকেরা গৃহস্থ এবং সংসার-নিবিষ্ট; কিন্তু যতিরা সংসারত্যাগী এবং স্বল্পাহারী ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসী মাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যতি হয়, তাহারা দেবতার্চ্চনা প্রভৃতি করে না। জৈন শ্রাবকেরাই মন্দিরান্ত-প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্কর প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা যে কেবল তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে তাহা নহে, অনেক হিন্দু দেবদেবীরও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদও একপ্রকার প্রচলিত আছে। ইহারা কোনপ্রকার জীবের প্রতি হিংসা করে না এবং বৎসরের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসে লবণ, অম্ল, মধু, ফল, মূল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহার করে না। ইহারা নীতি-শাস্ত্রের পাঁচটী নিয়ম সবিশেষ পালন করে। সে পাঁচটী নীতি এই,—

(১) জীবহত্যা করা উচিত নহে।

(২) সর্ব্বদা সত্য কথা কহা উচিত।

(৩) সরল এবং সৎস্বভাব হওয়া উচিত।

(৪) পতি ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হওয়া অথবা অন্যাসক্ত হওয়া উচিত নহে।

(৫) পার্থিব বাসনাসমূহ দমন করা একান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মবীর

অশোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাজার নাম শ্রুত হই, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ এখনও লোকসমাজে উজ্জ্বল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রাজা অশোক সর্ব্বপ্রধান। এক সময় ইহাঁর শাসন কপর্দ্দিগিরি হইতে উৎকল এবং ত্রিহুত হইতে গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রজাদিগের হিতজনক কার্য্য সর্ব্বদাই ইহাঁর মনে জাগরূক ছিল। ইনি এক জন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক, তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা ইহাঁর বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং স্বপ্রণীত গ্রন্থাদিতে ইহাঁর বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা ইহাঁর চরিত্র গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। অবদানশতক, দিব্য অবদান, এবং অশোক অবদান এই কএকখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে অশোকের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ শেষের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া অশোক জীবনীর সংক্ষিপ্ত-সার বিবৃত হইল। (১)

পাটলীপুত্র (২) নগরে বিন্দুসার নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মৌর্য্যকুলবীর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। তিনি যখন পাটলী-

---

(১) Asiatic Society's Journal.

(২) বৃহৎকথাগ্রন্থের অনুসারে ইহার সংস্থাপক পুত্র এবং তৎপত্নী পাটলীর নাম হইতে পাটলীপুত্র নাম হইয়াছে। কুসুম-নামে পুত্রের এক তনয় হইতে ইহার নাম কুসুমপুর। কুসুমের পাটনানাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার নামে আধুনিক নাম পাটনা। পাটনা দেবানুগৃহীতা হইয়া অদ্যাপি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

পুত্রে রাজ্য শাসন করিতেন, তৎকালে চম্পাপুরী হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে আপনার এক কন্যা উপহার দেন। ঐ কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না। কোন এক সময়ে দৈবজ্ঞেরা ঐ কন্যা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে কহিয়াছিল, তোমার কন্যার অঙ্গে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই রাজমহিষী হইবেন এবং ইহাঁর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। দৈবজ্ঞগণের বাক্যে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল এবং সেই বিশ্বাসবলে তিনি উপহারস্বরূপ আপন কন্যারত্ন বিন্দুসারকে অর্পণ করিলেন।

সুভদ্রাঙ্গী রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজমহিষীগণের অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল এবং উহাঁরা সামান্য কিঙ্করীর ন্যায় তাঁহাকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সুভদ্রাঙ্গীর প্রতি যে সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল তন্মধ্যে ক্ষৌরকার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। মহিষীরা কহিলেন যদি তুমি এই কর্ম্মে নৈপুণ্যলাভ করিতে পার তবে মহারাজ তোমার প্রতি যারপরনাই প্রসন্ন হইবেন।

সুভদ্রাঙ্গী ক্রমশঃ ক্ষৌরকর্ম্মে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। তখন একদা মহিষীরা কহিলেন, তুমি গিয়া মহারাজের ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া আইস। সুভদ্রাঙ্গী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং নৈপুণ্যের সহিত রাজার ক্ষৌরকর্ম্ম করিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার সংকল্পে

কহিলেন,বল তোমার কি অভিলাষ? সুভদ্রাঙ্গী তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাজা কহিলেন, দেখ, তুমি জাত্যংশে নিকৃষ্ট, সুতরাং আমি তোমার পাণিগ্রহণে কিরূপে সম্মত হইব। সুভদ্রাঙ্গী কহিলেন, মহারাজ, আমি জাতিতে নিকৃষ্ট নহি; রাজমহিষীগণের আদেশেই এইরূপ নীচ কার্য্য স্বীকার করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, রাজরাণী হইব বলিয়াই পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

তখন রাজা বিন্দুসারের সমস্তই মনে পড়িল। তিনি সুভদ্রাঙ্গীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং উহাঁকে মহিষীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান করিয়া রাখিলেন। এই সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়। পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া জননীর সকল শোক দূর হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত উহাঁর নাম অশোক। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বীতশোক হইল। অশোক কুরূপ ও কদাকার ছিলেন, তজ্জন্য বিন্দুসার তাঁহাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন না। অশোকের স্বভাবও অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। ফলতঃ তিনি এইরূপ বামশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম চণ্ড। রাজা বিন্দুসার তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য পিঙ্গলবৎসনামা কোন এক জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে অর্পণ করেন। এই জ্যোতিষিক তাঁহার নানারূপ সৌভাগ্য-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া কহেন, এই বালকই পিতৃসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবেন।

রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তাহা পূর্ব্ববৎ উগ্র ও

রুদ্ধ রহিল। তখন বিন্দুসার ভাবিলেন একণে অশোককে কার্য্যান্তরব্যপদেশে স্থানান্তরিত করাই কর্ত্তব্য। তৎকালে তক্ষশিলায় ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই স্থান রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বহুদূর। অশোক এই বিদ্রোহশান্তির জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, যখন অশোক তক্ষশিলায় যাত্রা করেন তখন নানারূপ অনুকূল দৈববাণী হইয়াছিল এবং তাঁহার যুদ্ধসাহায্যের জন্য আকাশ হইতে দিব্যাস্ত্র পতিত হইয়াছিল। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্রোহ-শান্তি করিলেন এবং তথায় পরমসমাদরে প্রতিষ্ঠিত হই-লেন।

বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুসীম। তিনি পাটলী-পুত্রে অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করেন। তন্নিবন্ধন প্রধান রাজমন্ত্রী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কৌশলক্রমে সুসীমকে তক্ষশিলায় প্রেরণ ও অশোককে পাটলীপুত্রে আনয়ন করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুকাল উপস্থিত। যদিও অশোককে রাজ্যভার অর্পণ করিতে তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মন্ত্রীর অনুরোধে অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন। একণে অশোক পাটলীপুত্রের রাজা। এ দিকে বিন্দুসারের মৃত্যুসং-বাদ পাইয়া সুসীম তক্ষশিলা পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পৈতৃক রাজ্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। রাধাগুপ্ত নামে অশোকের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। অশোক তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যে সুসী-মকে পরাজয় করিলেন এবং ভাবী অনিষ্ট নিবারণের জন্য

মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই রাজোদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ ফলপুষ্পের সহিত ছেদন কর। কিন্তু মন্ত্রিগণ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না তখন অশোক স্বহস্তেই রাজবংশীয় সকলের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য-সুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

তিনি একদা শুনিলেন অন্তঃপুরের কতকগুলি স্ত্রীলোক একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্রোধ উপজাত হইল এবং ঐ সমস্ত অপ্রিয়কারিণী রমণীকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য চণ্ডগিরিকনামা জনৈক ঘাতককে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং চণ্ডগিরিক ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে তন্মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্বে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের একজন বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং ঐ চণ্ডগিরিককেই বৌদ্ধসন্ন্যাসি-বিনাশে নিয়োগ করেন। এই সময় একটী বিস্ময়কর ঘটনা উপস্থিত হয়। সার্থবাহ নামে কোন এক ধনবান্ বণিক অন্যান্য বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সপরিবারে সমুদ্রযাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার একটী পুত্র হয়। সমুদ্রে জন্ম বলিয়া উহার নাম সমুদ্র। যখন সার্থবাহ বণিক বার বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তৎকালে সামুদ্রিক দস্যুর হস্তে পতিত হন এবং ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যান। তৎকালে কেবল বণিকপুত্র সমুদ্রই অনেক কষ্টে রক্ষা পান। সমুদ্র পিতৃমাতৃহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব; তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুক হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ভিক্ষার্থ

যদৃচ্ছাক্রমে ঐ চণ্ডগিরিকের গৃহে উপস্থিত হন। চণ্ড গিরিকও তৎক্ষণাৎ উহাঁকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হয়, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে অতিমাত্র বিস্মিত হইল এবং রাজা অশোককে শীঘ্র এই সংবাদ দিল। অশোক বৌদ্ধভিক্ষুদর্শনার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ভিক্ষুকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই অলৌকিক কার্য্য রাজা অশোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিল, এবং তদবধি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান হইলেন। পরে তিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশক্রমে কুক্কুটোদ্যান নামক স্থানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় বুদ্ধদেবের অঙ্গবিশেষ স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রামগ্রামে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি রামগ্রাম হইতে গঙ্গাতটে উপস্থিত হন। তথায় বহুসংখ্যক নাগা বাস করিত। তিনি উহাদের অনুরোধে উহাদের গ্রামে ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

অশোকের কুনাল নামে এক পুত্র জন্মে। ইহাঁর অপর নাম ধর্ম্মবর্দ্ধন। ইনি অল্প দিবসেই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকার লাভ করেন। একদা রাজা অশোক কুক্কুটোদ্যানে কোন এক যতির নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে যান। তথায় উপগুপ্তনামা আর একজন বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বপ্রবীণ যতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজা এই যতিকে বেণুবনস্থ মঠের সমস্ত ভারার্পণ করেন। উপগুপ্ত মথুরানিবাসী কোন এক ধনী লোকের পুত্র। ঐ ধনী উরুমুণ্ড পর্ব্বতে শোণ

স্বাসীনামা এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়েন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী পুত্র, অশ্বগুপ্ত, ধনগুপ্ত, ও উপগুপ্ত। তিনি এই তিনটী পুত্রকে ঐ সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। বুদ্ধ কহিতেন (৩) "আমার নির্ব্বাণের শত বৎসর পরে উপগুপ্ত নামে এক জন ভিক্ষু উৎপন্ন হইবেন।" বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক। অশোক বিম্বিসার হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। সুতরাং বুদ্ধের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে অশোকের সমকালীন কোন ব্যক্তির জন্ম অসম্ভব। যাহাই হউক, বুদ্ধদেবের এই ভবিষ্যৎ বাক্য রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের গুরু উপগুপ্তের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। অশোক ইঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করেন এবং ইঁহারই প্রবর্ত্তনায় তীর্থযাত্রা করিতে যান। তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে তিনি বহুদেশ দর্শন করেন। তিনি যে সমস্ত প্রদেশে পর্যটন করিয়াছিলেন তথায় এক একটী মঠ প্রস্তুত করিয়া দেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে তিনি অসংখ্য স্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চণ্ডনাম তিরোহিত হইল।

অনন্তর তিনি দেশমধ্যে প্রচার করিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি নূতন-ধর্ম্মপ্রচার এবং ইহার গৌরববিস্তার করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তিনি ধর্ম্মাশোকনামে প্রথিত হইয়া উঠেন। বুদ্ধগয়াতে যে বোধিবৃক্ষ

---

(৩) মম নির্বৃতিমারভ্য শতবর্ষে গতে উপগুপ্তনামা ভিক্ষুরুৎপৎস্যতে।

আছে, তাহার শোভাসম্পাদনার্থও তাঁহার অনেক ব্যয় হয়। এই বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। পরিষ্যরক্ষিতা নামে তাঁহার এক মহিষী ছিলেন। তিনি রাজা অশোককে পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পবিত্র বোধিবৃক্ষ নষ্ট করিবার নিমিত্ত মাতঙ্গীনাম্নী এক চণ্ডালীকে প্রচ্ছন্নভাবে নিয়োগ করেন। ঐ চণ্ডালী ঔষধ ও মন্ত্রবলে ঐ বৃক্ষ শুষ্ক করিয়া ফেলে। অশোক, বোধিবৃক্ষ নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া, শোকে অত্যন্ত অভিভূত হন। তৎকালে রাজ-মহিষী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পরিশেষে মহিষী বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ঐ চণ্ডালীকে নিয়োগ করিলেন। বৃক্ষও মন্ত্রৌষধিবলে পুনর্বার সজীব হইয়া উঠিল।

অনন্তর অশোক পাঁচ বৎসর বৌদ্ধসংসর্গে কালক্ষেপ করেন। তৎকালে তিনি গন্ধর পর্ব্বত হইতে আগত সপিণ্ডলভরদ্বাজনামা এক বৌদ্ধ যতিকে স্বরাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চম বৎসরান্তে আড়ম্বর সহকারে একটী ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে বিস্তর অন্ন বস্ত্র দান করেন।

এ দিকে অশোকের পুত্র কুনালের বিবাহকাল উপস্থিত হইল। কুনাল কাঞ্চনমালা-নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই অশোক কুনালকে বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তক্ষশিলায়,

প্রেরণ করিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহীদিগের অধিনায়ক। সে রাজকুমার কুনালের নিকট পরাস্ত হইলে দেশমধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি সংস্থাপিত হইল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদা অশোক স্বপ্নযোগে দেখিলেন, যেন রাজকুমার কুনালের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া দৈবজ্ঞদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কহিল, রাজন্! এক্ষণে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা—প্রাণনাশ, সন্ন্যাসী হইয়া দেশত্যাগ, বা অন্ধতা। ইহা শুনিয়া রাজা অশোক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তদবধি তিনি সমস্ত রাজকার্য্য কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন না।

তিষ্যরক্ষিতা নামে অশোকের আর এক মহিষী ছিলেন। তিনি কুনালের বিমাতা, তিনি রাজার স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই শুনিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া রাজকার্য্য স্বহস্তে লইলেন। তিনি কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ, আজ্ঞাদান এবং পত্রাদি স্বাক্ষর করিতেন। সপত্নীপুত্র বলিয়া কুনালের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। তিনি রাজকীয় মুদ্রায় পত্র অঙ্কিত করিয়া কুঞ্জরকর্ণকে এইরূপ লিখিলেন যে, তুমি আমার আদেশ পাইবামাত্র রাজকুমারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইবে। কুঞ্জরকর্ণ এই আদেশপত্র পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং এক জন চণ্ডালের সাহায্যে এই কঠোর রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিল। এ বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়।

পরে রাজকুমার কুনাল অন্ধ হইয়া ভিক্ষুকবেশধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিলেন। একদা

তিনি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে পাটলীপুত্রে উপস্থিত হন, এবং রাত্রি-কালে রাজার হস্তিশালায় আশ্রয় লন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর এবং জনপ্রাণী নিস্তব্ধ হইয়াছে, এই অবসরে রাজকুমার একাকী বংশীবাদন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা অশোক জাগরিত ছিলেন। তিনি বংশীরবে অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন। পর দিন অশোক প্রাতঃকালে বংশীবাদককে আহ্বান করি-লেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে তিনিই তাঁহার একমাত্র পুত্র কুনাল।

অনন্তর অশোক রাজকুমার কুনালকে এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুনাল তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহিলেন। তাহা শুনিয়া অশোক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং মহিষীর মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্ত অসি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কুনাল বুদ্ধদেবের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রতি এইরূপ দয়া ও সদ্ভাব প্রদর্শন করাতে তাঁহার অন্ধতাও দূর হইল।

অনন্তর রাজ্যের কতকগুলি লোক রাজা অশোককে রাজ্য-মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে একান্ত যত্নবান্ দেখিয়া বীতশোকের আশ্রয় লইল এবং যাহাতে রাজার বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধার হ্রাস হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিল। বীতশোক অশোককে পৈতৃক ধর্ম্মে আনিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কোনটীই বিশেষ ফলোপধায়ক হইল না। পরি-শেষে রাজমন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং গোপনে বীতশোককে নানারূপ প্রলোভন দেখাইলেন। অশোক

বীতশোকের দুশ্চেষ্টার বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন রাজমন্ত্রী মধ্যস্থ হইয়া সপ্তাহকাল ক্ষমা চাহিলেন। ইত্যবসরে বীতশোকও পলায়নপূর্ব্বক উপগুপ্তের আশ্রয় লইলেন এবং উপগুপ্তের শিষ্য গুণাকরের প্রসাদাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হইল না। ঐ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম শত্রু উদিত হয়। ঐ ব্যক্তি আপনার প্রতিকৃতির পাদমূলে বুদ্ধের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া সেই আলেখ্য সর্ব্বত্র প্রচারপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের সাতিশয় নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ এই ব্যাপার রাজ্যের সর্ব্বত্র অত্যন্ত প্রচার হইয়া উঠিল। তখন অশোক তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলেন এবং যে এই কার্য্য সমাধা করিবে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই পারিতোষিক-লোভে একদা এক জন আভীর ভ্রান্তিক্রমে বীতশোককে ধরিল এবং তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটাভার দেখিয়া তাঁহাকেই বুদ্ধশত্রু স্থির করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। তখন অশোক বীতশোকের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উপগুপ্তের নিকটে গিয়া ধর্ম্মোপদেশে দুঃখ শান্তি করিলেন।

অশোকের দেবী নামে আর এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহেন্দ্রনামা এক তনয় এবং সঙ্ঘমিত্রানাম্নী এক তনয়ার জন্ম হয়। ইঁহারা উভয়ে তরুণবয়সে সিংহলদ্বীপে যাত্রা

করেন, এবং তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য ভূপতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

রাজা অশোক দক্ষিণাপথবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। প্রচারকেরা উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের সহিত দক্ষিণাপথপ্রদেশে আধিপত্যবিস্তারও অশোকের অভীপ্সিত ছিল। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের এই একটী মহোপকার। অশোকনৃপতির এই চেষ্টাদর্শনে ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল হইয়া মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অশোক নরপতি ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্যবিস্তার হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মাশোক এবং প্রিয়দর্শী নামে কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদাত্মজগণ তদীয় সুবিশাল রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্চনদপ্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। ইনি ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রথিত হন। জলোকনামা আর এক পুত্র কাশ্মীররাজ্য গ্রহণ করিলেন। পাটলীপুত্র তাঁহার তৃতীয় পুত্রের শাসনাধীন রহিল। সংবৎপ্রারম্ভের ২০৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ এবং শাক্যসিংহের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৪৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মা-

অবলম্বন করেন। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহার পিতা বিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণমতে অশোকপুত্র সুযশা মগধের রাজা হন।

কাথিবারপ্রদেশে গির্ণারপর্ব্বতে, পেশোরসন্নিহিত কপর্দিগিরিতে, উড়িষ্যান্তর্গত ধাউলীতে এবং দিল্লী ও প্রয়াগনগরের লাট অর্থাৎ স্তম্ভসমূহে অশোকবর্দ্ধনের বিস্তর অনুশাসনলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপিতে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত এবং তাঁহার রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীসম্পর্কীয় নানা বিষয় উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মানুশাসনের জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে দুর্বৃত্ত, নৃশংস, এবং অনুদার ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ হইবার পর তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নবীভাব ধারণ করিল। তিনি সুবৃত্ত, সদাত্মা, এবং উন্নতাশয় হইয়া উঠেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নামে প্রিয়দর্শী এবং কার্য্যে সমদর্শী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কে তুল্যভাবে দর্শন করিতেন। মনুষ্য এবং পশুজাতির উপকারার্থে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও উদ্যান স্থাপিত হয়। তিনি স্বীয় অনুশাসনপত্র দ্বারা প্রজাদিগকে নীতিমান্ ও ন্যায়বান্ হইতে আদেশ করেন। এই সকল অনুশাসনপত্র পাঠ করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয় যে, অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশুদ্ধ এবং দোষলেশশূন্য ছিল। অনুশাসনগুলি সাম্য এবং ন্যায়পরতার উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি রাজ্যশাসন-

প্রণালী-বিষয়ক এবং কতকগুলি নিজচরিত্রসংক্রান্ত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলির মতে মানবজাতির এক সর্ব্ব-সাধারণ ধর্ম্ম হওয়া উচিত। ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভোগই ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার। জনকজননীর প্রতি ভক্তি, আত্মীয় প্রতিবাসী ও বন্ধুজনের প্রতি, স্নেহ ও প্রীতি, পশুজাতির প্রতি দয়া, ভৃত্যাদি নিকৃষ্ট জনের প্রতি সদাচরণ, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি সম্মান, নিন্দাবাদ ও কুৎসাপরিহার, ক্রোধ লোভ নিষ্করুণতা অমিতব্যয়িতা প্রভৃতির দমন, সদাশয়তা সম-দর্শিতা ভূতানুকম্পা প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রবৃত্তিবিধায়ক ভূরি ভূরি উন্নত উপদেশ ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুশাসনাবলীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোক প্রচারক-দিগকে সর্ব্বত্র এই সমস্ত উপদেশ প্রচার করিতে বলিতেন। এই সকল উপদেশ পালন দ্বারা স্বর্গসুখলাভ হয়, এবংবিধ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত।

রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় অনুশাসনগুলির তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, আহার বা যজ্ঞের নিমিত্ত জীবহত্যা-নিষেধ; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় রাষ্ট্র মধ্যে ঔষধশালা ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন; এবং তৃতীয়তঃ, নীতিশিক্ষার প্রবর্ত্তন। অহিংসা ও প্রাণিবর্গের প্রতি কারুণ্য অশোকের অনুশাসন-পত্রনিবহের মূল বিষয়। অশোক প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়কন্দর জন্তুগণের প্রতি দয়ারসে অভিষিক্ত ছিল। পূর্ব্বে তিনি মাংস আহার এবং যাগার্থে পশুবধ করিতেন। তৎকালে তিনি প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ

ভোজন করাইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার মানসিক গতি ও ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্য এবং পশু-দিগের ব্যাধি-প্রতীকারের জন্য যেমন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজপথে মধ্যে মধ্যে কূপখনন এবং ছায়া-তরু রোপণ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। নীতিশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এবং দুষ্টব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত ও শিষ্টব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশে কতক-গুলি পুরুষ নিযুক্ত হয়। ইহাদিগের হস্তে অনুসন্ধান এবং শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট অনুশাসন দ্বারা অশোক প্রজাদিগকে ধর্ম্ম-মার্গে আনয়ন করিতে অধিকতর সফল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনগুলিতে প্রজাদিগের চিত্ত আশানুরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। শেষ অনুশাসনগুলি স্বচরিত্রসম্বন্ধীয়। এই সকল হইতে জানা যায় যে, অশোক মৃগয়া, বৃথাটন্যা, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ দিগকে ভিক্ষাপ্রদান এবং সন্দর্শন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি আগমবৃদ্ধ, শীলবৃদ্ধ, এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিতেন। তিনি দেশ ও প্রজাগণের অবস্থা পরিদর্শন, নৈতিক নিয়মপ্রচার এবং নৈতিক ব্যবহার প্রচলন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি অন্য ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতেন না। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই তাঁহার সমীপে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। সর্ব্বত্রই হিতকর এবং ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য সকল তাঁহার দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত হইত। সর্ব্ববিধ-

ধর্ম্মাশ্রয়ীরাই তাঁহার দানে অধিকৃত ছিল। তিনি বলিতেন ধর্ম্মকার্য্যে দানই প্রকৃত দান এবং ইহা হইতেই প্রকৃত সুখের উদয় হয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বসময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে সে উন্নতির গতিরোধ হয় নাই, বরং পরিসরবৃদ্ধি হয়। গুর্জ্জর, কাবুল, কাশ্মীর, প্রয়াগ, দিল্লী, কটক, প্রভৃতি স্থানে স্থানে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার শাসনবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব, সুখ, ও শান্তি বিরাজিত। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরল প্রভৃতি (৪) জনপদেও তাঁহার শাসন প্রসারিত হয়। ধর্ম্মের যথেষ্ট অনুশীলন হইত বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরস্কারের আশায় লোকে ধর্ম্মের অনুসরণ এবং শাস্তির আশঙ্কায় পাপের পরিবর্জ্জন করিত।

অশোকের রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। ইহাতে একসহস্র যতি উপস্থিত ছিলেন। বিনয় ও অভিধর্ম্মনামক গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ হইত, এবং নব মাস ইহা চলিয়াছিল। ইহাতে যে যতি সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়

---

(৪) চোল আধুনিক তাঞ্জোর (Tanjore)। পাণ্ড্য মাদুরা (Madura) এবং টিনেবেলী (Tinnevelly)। সত্যপুত্র নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থিত সাতপুরা শৈলশ্রেণী অর্থাৎ মহারাষ্ট্র হোলকারের রাজ্য। কেরল মালাবার উপকূল প্রদেশ।

নিবসনের উপায় সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করেন। এই সমিতির পরেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চতুর্দ্দিকে প্রচারক সকল প্রেরিত হন। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে এবং মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। কাশ্মীর এবং গান্ধার দেশে মধ্যান্তিকনামা জনৈক প্রচারক গমন করেন। মহীশ প্রদেশে মহাদেব, বনবাসিদেশে রক্ষিত, অপরান্তকজনপদে ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, হিমবদঞ্চলে মধ্যিম, যোনলোকে মহারক্ষিত, সুবর্ণভূমিতে সেন ও উত্তর (৫), এবং লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা প্রেরিত হন। ইহাঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অশোক নৃপতির নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। ভারতের ইতিহাস হইতে তাঁহার নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। তিনি যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তিনি অমর হইয়া চিরদিন ইতিহাসের বরণীয় থাকিবেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

---

(৫) মহীশ দেশ গোদাবরীনদীর দক্ষিণে স্থিত নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। বনবাসিজনপদ সম্ভবতঃ রাজপুতানার প্রকাণ্ড মরুভূমির প্রান্তদেশ। অপরান্তক পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমাংশ। যোনলোক বর্ত্তমান ব্যাকট্রিয়া (Bactria)। সুবর্ণভূমি মালেয়া উপদ্বীপ (Malay), অথবা রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূল প্রদেশ।

দানবীর

ভোজপ্রমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ভোজপ্রমারের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। ধারানগরীপতি ভোজরাজ যশস্বী নৃপতি, বিখ্যাত গ্রন্থকার এবং বিদ্যার অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। কি কাব্য, কি উপন্যাস, কি উপাখ্যান—সর্ব্বত্র ইঁহার নাম প্রশংসার সহিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি ইঁহার সমস্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ভোজ-প্রবন্ধ এবং ভোজচরিত নানাবিধ কাল্পনিক উপাখ্যানে পরি-পূর্ণ। বল্লাল প্রভৃতি অনেকে প্রকৃত ইতিহাসকে এরূপ অতি-রঞ্জিত করিয়াছেন যে, তাহার সারনিষ্কর্ষ প্রায় দুরূহ। "এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল" প্রভৃতি গ্রন্থে ভোজবিষয়ক কতকগুলি বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। হর্ষ-চরিত, কুমারপাল-চরিত, বিক্রম-চরিত, নব সাহসাঙ্ক চরিত, বিক্রমাঙ্ক চরিত, ভোজ-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে হর্ষ প্রভৃতি রাজগণের ইতিহাস অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়। এ প্রস্তাবে আমরা ভোজ নৃপতির সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

ভোজ নামে অনেকগুলি রাজা এবং বিখ্যাত ব্যক্তি জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রভেদ করা যায় না। অনেকের সংস্কার এই যে, ভোজ নাম দেখিলেই ধারাধিপ ভোজপ্রমার স্থির করিতে হইবে। এ সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ঋগ্বেদসংহিতার তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে

বিংশবর্গের সপ্তম সূক্তে ভোজ নাম লক্ষিত হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ইহার 'সুদাসবংশীয় ক্ষত্রিয়' অর্থ করিয়াছেন (১)। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ভোজ নাম দুই বার দৃষ্ট হয়। পাণ্ডব-জননী কুন্তী ভোজনরপতির পালিত কন্যা। দ্রৌপদী-স্বয়ংবর-স্থলে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ ভোজনামক আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইনি বিহারান্তর্গত ভোজপুরের অধিনায়ক। মহা-ভারতের অন্য এক স্থলে উল্লিখিত আছে "যদুর বংশধরগণ যাদব নামে বিখ্যাত, তুর্ব্বসুর বংশধরগণ যবন নামে বিদিত, দ্রুহ্যুবংশীয়গণ ভোজ নামে পরিচিত, এবং অনুর সন্তানগণ ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া বিজ্ঞাত।" ইহা দ্বারা ভোজ একটী গোত্র-নাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রঘুবংশে অপর এক ভোজ ভূপতির উল্লেখ আছে। উড়িষ্যার ইতিবৃত্তে আমরা আর এক জন ভোজকে প্রাপ্ত হই। ইনি ৩ হইতে ১৩৩ সংবৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং ইহাঁর সভাতে কালিদাস প্রভৃতি ৭৫০ জন কবি বিদ্যমান ছিলেন (২)। ইহা সকলেই জানেন যে, যেখানে বিক্রমাদিত্য বা ভোজ নৃপতি, সেখানেই কালি-দাস। ভারতে বিক্রমাদিত্য এবং ভোজ অনেকগুলি; সুতরাং কালিদাসও অনেকগুলি। এইরূপ অনেকগুলি

---

(১) 'ইমে ভোজা আঙ্গিরসোবিরূপাঃ'—ঋগ্বেদ, ৩ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৭ ঋক।

"ইমে যাগং কুর্ব্বাণা ভোজাঃ সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বিরূপাঃ নানারূপাঃ"—সায়ণঃ।

(২) As. Soc. Journal. No. II. 1863. p 93.

ভোজের নাম করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ভানুমতী নামে একখানি বাঙ্গালা উপন্যাসে ভোজকে বিক্রমার্কের শ্বশুর এবং ভোজবাজির প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। আমাদের দেশে বেদিয়ারা যে বাজি করিয়া থাকে তাহাকে ভোজবাজি বলে, এবং উহাদের মতে ভোজ ঐ বাজির প্রবর্ত্তয়িতা। এই সকল ভোজ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমরা ধারানগরীর অধীশ্বর প্রমারবংশীয় ভোজনৃপতির কথা বলিব।

মালব দেশে ধারারাজ্যে সিন্ধুরাজসুত সিন্ধুল নামে জনৈক রাজা ছিলেন। মালব দেশ বহুকাল হইতে বিদ্যা, সভ্যতা এবং বিশুদ্ধ নীতির নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। সিন্ধুল নৃপতি বহু বৎসর নিজ প্রজাগণকে পুত্র-নির্বিশেষে পরিপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার বৃদ্ধ বয়সে ভোজ নামে এক পুত্র জন্মে। ভোজ পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক হইলে সিন্ধুল নৃপতি আপনাকে জরাপ্রপীড়িত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাহার পুত্র অতি শিশু এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঞ্জ মহাবলসম্পন্ন, অতএব যদি তিনি অনুজকে রাজ্য না দিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন তাহা হইলে লোকাপবাদ হইবে এবং রাজ্যলোভ-বশতঃ মুঞ্জও বিষাদিপ্রয়োগে ভোজের বিনাশসাধন করিতে পারেন। সুতরাং ভোজকে রাজা করিলে পুত্রহানি এবং বংশোচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি মুঞ্জকে রাজ্যভার-প্রদান-পূর্ব্বক ভোজকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর রাজার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে মুঞ্জ ভূপতি মুখ্যামাত্য বুদ্ধিসাগরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত

করিলেন এবং স্বপুত্র জয়ন্ত ও ভ্রাতৃজ ভোজকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ভোজ নানাশাস্ত্রকুশল হইয়া উঠিলেন। ভোজপ্রবন্ধের মতে মুঞ্জ সিন্ধুলের অনুজ ভ্রাতা। কিন্তু ভোজ-চরিতে মতান্তর দৃষ্ট হয় (৩)। উহার অনুসারে সিন্ধু নৃপতি একদা মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে মুঞ্জতৃণের উপর একটী নবজাত শিশু দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া নিজ ভার্য্যা পদ্মাবতীর হস্তে পালনার্থ অর্পণ করিলেন। এই শিশুই শেষে মুঞ্জ নামে বিখ্যাত হয়। সুতরাং মুঞ্জদেব ভোজদেবের আপনার পিতৃব্য নহেন।

মুঞ্জদেবের রাজ্যশাসনকালে একদা সকলবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞ এক জন বিপ্র রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া রাজসকাশে পরিচয় দিলেন। মুঞ্জদেব নানাবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া সদুত্তরলাভে পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভোজের জন্মপত্রিকা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভোজ বিপ্রসমীপে আনীত হইলে, বিপ্র তাঁহাকে যত্ন-পূর্ব্বক সন্দর্শন করিয়া রাজাকে বলিলেন "ভোজের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে স্বয়ং বিধাতাও সমর্থ নহেন, আমি সামান্য উদরম্ভরি ব্রাহ্মণ কি করিতে পারি। তথাপি স্বমতি-অনুসারে বলিতেছি। ভোজকে অধ্যয়নশালাতে প্রেরণ করুন" তিনি আরও বলিলেন "ভোজ পঞ্চান্ন বৎসর সপ্ত মাস এবং তিন দিন গৌড়দেশ সহিত দক্ষিণাপথ শাসন করিবেন।"

---

(৩) As. Soc. Journal No. II. 1808. p. 102.

"পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসদিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ ॥"

ইহা শ্রবণ করিয়া মুঞ্জ মহীপাল অন্তরে ব্যথিত হইলেন, এবং বঙ্গদেশাধীশ্বর বৎসরাজকে আহ্বানপূর্ব্বক ভোজকে উপাংশু বধ করিতে আদেশ দিলেন। বৎসরাজ এক জন অধীন করদ রাজা। বৎসরাজ রাজাজ্ঞা সাধনার্থ সন্ধ্যাকালে ভোজকে লইয়া ভুবনেশ্বরী-বনে গমন করিলেন এবং রাজার আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। ভোজ একটী শ্লোক লিখিয়া বৎসরাজের হস্তে দিলেন এবং তাঁহাকে রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিতে বলিলেন। কিন্তু বৎসরাজ তাহা করিলেন না এবং ভোজকে গোপনে রক্ষা করিয়া কৃত্রিম-বিদ্যাবিৎ ব্যক্তিদিগের দ্বারা কুণ্ডলযুক্ত নিমীলিতনেত্র কুমার-ভোজ-মস্তক নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা নৃপতি-সমীপে স্থাপন করিলেন। নৃপতি বৎসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুমারভোজ খড়্গ প্রহার সময়ে কি বলিয়াছিল? বৎসরাজ সেই শ্লোকটী রাজাকে দিলেন এবং তিনি উহা প্রদীপের আলোকে পাঠ করিলেন,

মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগালঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ কাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী নূনং ত্বয়া যাস্যতি

অর্থাৎ সত্যযুগের অলঙ্কারভূত মান্ধাতা মহীপতি পর-লোকগত হইয়াছেন। মহাসমুদ্রোপরি যিনি সেতুবন্ধন

করিয়াছিলেন, সেই দশানন-রিপুই বা কোথায়? অন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারাও স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে রাজন্! বসুমতী কাহারও সঙ্গে গমন করে নাই, নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যাইবে।

রাজা এই শ্লোক পাঠ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, এবং চৈতন্যলাভান্তে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই রাত্রিতেই বহ্নিপ্রবেশ দ্বারা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সংকল্প করিলেন। তখন বৎসরাজ বুদ্ধিসাগর নামক অমাত্যের পরামর্শানুসারে কুমার ভোজকে গুপ্ত স্থান হইতে আনয়ন করিয়া জনৈক কাপালিক দ্বারা ভোজ জীবিত হইয়াছেন এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। পরে ভোজ রাজসন্নিধানে আনীত হইলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বহুপরিদেবনানন্তর তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সস্ত্রীক তপোবনে প্রয়াণ করিলেন। ভোজদেব রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভোজচরিতে মুঞ্জদেব-সম্বন্ধে ভিন্নপ্রকার এই একটী কথা আছে। চালুক্য-বংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপাল শ্রীতৈলপ মুঞ্জদেবকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। চালুক্যবংশীয়-তাম্রশাসন-পত্র হইতেও এই আক্রমণ ও বন্দীকরণ প্রমাণিত হয়। এই মুঞ্জরাজ-সভাতে ধনিক নামে জনৈক পণ্ডিত দশরূপাখ্য অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুঞ্জ মহীপাল বাক্‌পতিরাজ নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীতৈলপ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্য করিয়াছিলেন। ভোজ-চরিত এবং ভোজ-প্রবন্ধের বিবরণ কতদূর সত্য এবং

বিায়ন্য, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। মতান্তরে মুঞ্জদেব পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৪)। কুমারপাল-চরিত অনুসারে মুঞ্জদেব ১০২০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভোজদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ভোজপ্রবন্ধের মতে তিনি প্রথমে কৃপণ ছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই অত্যন্ত দাতা হইয়া উঠিলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিত সকল তাঁহার সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মাননা করিয়া, তাঁহাদিগকে বিস্তর পারিতোষিক প্রদান করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশে ভোজদেবের যশোগান হইতে লাগিল। ভোজ-প্রবন্ধের মতে ধারানগরে তৎকালে একজন মূর্খ ব্যক্তিরও বাস ছিল না। ইহাতে কেবল বহুসংখ্যক পণ্ডিতের নাম, তাঁহাদের রচিত শ্লোক এবং রাজার পুরস্কার উল্লিখিত আছে। গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে কোবিদবৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থের উপর অণুমাত্র শ্রদ্ধা হইতে পারে না। তিনি যে কি করিয়া কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতিকে এক রাজার সভায় পুরস্কৃত বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভোজরাজ-সভাতে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ, শঙ্করকবি, বররুচি, বাণ, ময়ূর, হরি, গোবিন্দ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র, কচ্ছিঙ্গ,

(৪) As. Soc. Journal, No. II. 1863, p-110,

লক্ষ্মীধর, সীতাকবি, সুবন্ধু, রামেশ্বর, মহেশ্বর, চোলপণ্ডিত, তণ্ডুলদেব, সীমন্ত, শুকদেব, বাসুদেব, সোমনাথ, বিষ্ণু, মুচুকুন্দ, গোপাল, ভাস্কর, শাকল্য, শাস্তবদেব, জয়দেব, কবিশেখর, দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ সৎকৃত এবং পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় ভোজপ্রবন্ধ-রচয়িতা স্বয়ং যত কবির নাম জানিতেন, সকলকেই ভোজরাজ-সভাতে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছেন। নতুবা এই সমস্ত কবি ভোজসভাতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিলে প্রত্যক্ষ ইতিহাসের অবমাননা করা হয়।

ভোজরাজের জীবনী-লেখকেরা বলেন, তিনি পঞ্চাশ বৎসর নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি-বিহ্লণ-বিরচিত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে (৫) আমরা দেখিতে পাই যে, চলুক্যবংশীয় প্রথম সোমেশ্বর ভোজরাজধানী ধারানগরী আক্রমণ করেন এবং ভোজরাজকে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। এই সোমেশ্বরদেব ১০৪০ হইতে ১০৬৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং তিনি আহবমল্লদেব ও ত্রৈলোক্য-মল্লদেব নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি বিহ্লণ ভোজরাজের সমসাময়িক কবি ছিলেন এবং নানা স্থান পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ-কালে ভোজরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কারণবশতঃ ভোজরাজসভাতে

---

(৫) প্রথম সর্গ ৯১—৯৬ শ্লোক। ডাক্তার বুলার প্রকাশিত সংস্করণ, ৯ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিহ্লণ কবি ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন এবং বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ত্রিভুবনমল্লদেবনামান্তর বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬-১১২৭) সভাতে অবস্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গের ২৫৮ শ্লোকে লিখিত আছে যে ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতিরাজ এবং ভোজরাজ দুইজন প্রকৃত কবি-বান্ধব ছিলেন। অতএব এইসময়ে ভোজরাজ বর্ত্তমান ছিলেন। অধ্যাপক ল্যাসেন ভ্রান্ত হইয়া ভোজরাজত্বকাল ৯৯৭ হইতে ১০৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে ভোজরাজ ১০২৬ হইতে ১০৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বেণ্টলী প্রমাণান্তর প্রয়োগ পূর্ব্বক ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজের রাজত্ব শেষ হয় নির্ণয় করিয়াছেন (৬)। ডাক্তার বুলার সাহেব তাঁহার বিক্রমাঙ্ক-চরিতের পূর্ব্ব-পীঠিকার ২৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে ভোজরাজের করণ রাজমৃগাঙ্ক ১০৪৩ অব্দে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে ভোজরাজ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধারারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ভোজরাজ যে সময়ে ত্রৈলোক্যমল্ল দেবের আক্রমণবশতঃ রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভিন্ন তাঁহার রাজ্যশাসনের আর কোন ব্যাঘাত আমরা জ্ঞাত নহি। কেহ কেহ এই আক্রমণের পরিবর্ত্তে একটী নূতন

(৬) As. Res. Vol. VIII. p. 243.

কথা বলেন। কোন সময়ে জনৈক যোগী ভোজরাজকে এক শরীর হইতে শরীরান্তরে আত্মা প্রবেশ করাইতে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। এই যোগী ছলপূর্ব্বক ভোজরাজের আত্মা বা সূক্ষ্ম শরীর এক শুক পক্ষীর শরীরে প্রবেশিত করিয়া স্বয়ং রাজশরীরে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনি রাজ্য করেন। অবশেষে চন্দ্রাবতীপতি চন্দ্রসেনের সাহায্যে ভোজ যোগীকে নিজ-শরীর হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন এবং স্বয়ং নিজ শরীরে প্রবেশ করেন। ভোজরাজের স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্য পুত্র গজানন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যত্র আবার উদয়াদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়। এই মতে ভোজরাজের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে উদয়াদিত্য নামে তাঁহার কোন আত্মীয় রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ইনি উৎসাহশীল, অসাধারণ বীর এবং শত্রুদমন ছিলেন (৭)। ভোজপ্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভোজ নৃপতির সভাতে কখন কোন বিদ্বান্ এবং গুণী ব্যক্তি ব্যর্থ-মনোরথ হন নাই। তাঁহার অজস্র দান অবলোকন করিয়া প্রধান অমাত্য তাঁহাকে অর্থরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে "আপদের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু লক্ষ্মী অপগতা বা কুপিতা হইলে সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হইয়া যায়।' তিনি সুবিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী এবং পণ্ডিতদিগের দৈন্য বিমোচনে মুক্ত-

(৭) As. Soc. Journal No. II 1868 p 102 and p. 105.

হস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং নানাশাস্ত্রার্থকুশল এবং সুকবি ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রবিৎ এবং কবিদিগের বন্ধু হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ-লীলাযিত ভুবনবিদিত এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভোজপ্রবন্ধের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা হইতে কালিদাস যে অদ্বিতীয়কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। কালিদাস কখনই ভোজরাজের সভাতে ছিলেন না; অথবা যিনি ছিলেন তিনি অন্য কোন কালিদাস হইতে পারেন। ভোজপ্রবন্ধকার বল্লাল মিশ্রের বর্ণনা বিশ্বাস করিতে হইলে বিষম কাণ্ড হইয়া উঠিবে। কালিদাস এক সময়ে কোন কারণে রুষ্ট হইয়া ভোজ সভা পরিত্যাগ করিয়া একশিলা নগরে গমন করিয়াছিলেন। কালিদাস-বিয়োগে শোকাকুল ভোজদেব তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে কাপালিক-বেশে একশিলা নগরীতে যাত্রা করিলেন। তথায় কালিদাস যোগিবেশধারী ভোজদেবকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি ধারানগরে বাস করেন। তখন কবিবর ভোজভূপতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলে যোগী উত্তর দিলেন যে ভোজদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এতৎশ্রবণে কালিদাস ভূতলে পতিত হইয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং এই চরম শ্লোক রচনা করিলেন—

অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ দ্যুলোকগত হইলে অদ্য ধারানগরী আধারশূন্য, সরস্বতী অবলম্বন রহিত এবং পণ্ডিতগণ খণ্ডিত

হইলেন। কবি এই শ্লোক বলিতে না বলিতে যোগী বিসংজ্ঞ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। কালিদাস তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিবা ভোজদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। এই বলিয়াই প্রোক্ত শ্লোক প্রকারান্তরে তৎক্ষণাৎ পাঠ করিলেন,

অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।

পণ্ডিতা মণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥

অর্থাৎ ভোজরাজ পৃথিবীগত হইলে অদ্য ধারানগরী সজ্জনের আধার, সরস্বতী উৎকৃষ্টাবলম্বনবিশিষ্ট এবং পণ্ডিতগণ মণ্ডিত হইলেন। তদনন্তর কালিদাস ভোজরাজকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত ধারানগরে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন।

কি ভোজপ্রবন্ধ, কি ভোজচরিত, কিছুতেই তাঁহার জীবনচরিত উপযুক্তরূপে বিবৃত হয় নাই। উভয় গ্রন্থই কতকগুলি কাল্পনিক ও অমূলক গল্প ও উপাখ্যানে পরিপূরিত। অন্যান্য পুরাতত্ত্বপ্রিয় কোবিদগণও গবেষণা দ্বারা ভোজরাজ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা বিবৃত হইল। ভোজরাজ চম্পূরামায়ণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, অমরটীকা, রাজবার্ত্তিক, পাতঞ্জলদর্শনভাষ্য এবং চারুচর্য্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সুকবি, কাব্যপ্রিয় এবং অশেষগুণমণ্ডিত ছিলেন। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে যতকাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে ততকাল ভোজপ্রমার এবং তাঁহার নবরত্নের নাম বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইবে না। কর্ণেল টড তিন জন ভোজরাজের কাল

নিরূপণ করিয়াছেন। প্রথম ভোজ ৬৩১ সংবতে, দ্বিতীয় ভোজ ৭২১ সংবতে এবং তৃতীয় ভোজ ১১০০ সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই শেষ ভোজ আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের বিষয়। ইঁহার নবরত্ন ছিল না। ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া বহু-সংখ্যক পণ্ডিত ইঁহার সভাসদ ছিলেন। ইঁহার নবরত্ন থাকিলে ভোজপ্রবন্ধকার অবশ্যই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। বিক্রমাদিত্যদেবের নবরত্ন ছিল এবং কালিদাস প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বহুশতাব্দী পরে ভোজরাজ ধারানগরীর রাজপাটে আসীন হন। ভোজদেব তাহার গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে কুত্রাপি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, মল্লিনাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ভোজ-প্রবন্ধের কথা অপ্রামাণিক। ভোজপ্রবন্ধ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে কালিদাস, জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, ময়ূর, মাঘ, মল্লিনাথ এবং সুবন্ধু ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। ভোজপ্রবন্ধমতে মাঘ গুর্জ্জর-দেশ হইতে, ভবভূতি বারাণসী হইতে, এবং মল্লিনাথ দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 'বিশ্বগুণাদর্শ' গ্রন্থের অনুসারেও মাঘ, চোরকবি, ময়ূর, মুরারি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে এই সকল কবি সমসাময়িক নহেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।